স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়

ভারতীয় জাতির সংহতি

ডঃ সমীর কুমার দাশগুপ্ত

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় ভারতীয় জাতির সংহতি

ডঃ সমীর কুমার দাশগুপ্ত

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅমিত কুমার দত্ত, সাধারণ সম্পাদক
অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল
৬/১এ, জাস্টিস্ মন্মথ মুখার্জী রো,
কোলকাতা-৭০০ ০০৯

© মহামণ্ডল কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

First Edition : December 2024,
1M1C
ISBN 978-81-964732-3-5

প্রাপ্তিস্থান ঃ
মহামণ্ডল কার্যালয়,
৬/১এ, জাস্টিস্ মন্মথ মুখার্জী রো,
কলিকাতা-৭০০০০৯। ফোন—২৩৫০-৬৮৯৮

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা

মুদ্রক ঃ
বিবেকানন্দ মুদ্রণালয়,
চাকদহ, নদীয়া

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় ভারতীয় জাতির সংহতি

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে পঁচাত্তর* বছর আগে। সেই সময়ে যে ভারতবর্ষ আমরা পেয়েছিলাম, ভাষা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, জীবনযাপনের পদ্ধতি প্রভৃতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও সে ভারতবর্ষ আজও অখণ্ড রয়েছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বিক্ষোভ-প্রতিবাদ, অভিযোগ, দাবী সত্ত্বেও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ থেকেছে। তা সত্ত্বেও, যদি আমরা ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার দিকে একটু গভীরভাবে দৃষ্টি দিই, তবে দেখব ভারতবর্ষের সংহতি ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নানাভাবে তার সার্বিক ঐক্য বিঘ্নিত হচ্ছে। এ বিষয়ে এখনই যদি সচেতন হয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে ভারতের অখণ্ডতা বিপন্ন হবে না – একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

বিভিন্ন ভাষার মধ্যে দ্বন্দ্ব এখনও চলছে, একটি বিশেষ ভাষাকেই (হিন্দী ভাষা) সমগ্র ভারতবর্ষে চালাবার চেষ্টা চলছে এবং এই চেষ্টার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছে। প্রদেশে প্রদেশে বিরোধ এখনও মেটেনি; এমনকি কোনো কোনো প্রদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা নিয়ে বিবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সেই বিবাদের মীমাংসার জন্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে এখনও আমরা ব্রাহ্মণ-দলিত, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ – নানা বিভাজন করে চলেছি এবং জাতপাত ও ধর্মের ওপর ভিত্তি করে সাধারণ নির্বাচনের প্রার্থী ঠিক করছি। ভারতবর্ষ বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল মুখ্যত ভাষার ভিত্তিতে।

*প্রবন্ধটি ২০২২ সালে লিখিত

পরবর্তীকালে আবার কোন কোন রাজ্যকে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বা কোন গোষ্ঠীর স্বার্থে অথবা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক দাবীদাওয়া রক্ষার্থে ভাগ করা হয়েছে এবং এখনও প্রায়ই নানা কারণে বিভিন্ন রাজ্যকে ভাগ করার দাবী উঠছে। আর এখন সব থেকে বড় বিপদ বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বিরোধ ও বিবাদ। এক ধর্মের মানুষের প্রতি অন্য ধর্মের মানুষের অবিশ্বাস, সন্দেহ, বৈরিতা, ঘৃণা দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি কোন কোন ইসলাম ধর্মাবলম্বি নেতা বলছেন, ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম বিপন্ন; আবার হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বলছেন, "হিন্দুদের ভারতবর্ষে" হিন্দুদেরই অস্তিত্ব আজ বিরাট সঙ্কটে। কিছুদিন আগে এক সমাবেশে বৌদ্ধ ধর্মের অনুগামীরা প্রকাশ্যে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, কেনো হিন্দু দেবদেবীর প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন না। আদিবাসী সমাজের কিছু সম্প্রদায় তাঁদের ধর্মের পৃথক অস্তিত্বের স্বীকৃতি দাবী করেছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত কনফারেন্সে তাঁরা জানিয়েছেন, "Adivasis were never Hindus, neither they will ever be." –"আদিবাসীরা কখনও হিন্দু ছিল না, কোনোদিন হিন্দু হবেও না।" কোন্ ধর্মস্থান কোন্ ধর্মমতের অধিকারে থাকবে, সে বিবাদ দীর্ঘদিনের। ফলে অপরের ধর্মস্থান ভেঙ্গে ফেলতে বা অপবিত্র করতেও আমরা অনেকে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করি না। ভারতবর্ষে ধর্মে ধর্মে এই বিরোধ চলছেই – কখনও প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে। এই বিরোধ, এই বিদ্বেষ বিবাদ মাঝে মাঝে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়

যে, ভাবতে অবাক লাগে – এ-ই কি স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ ? স্বামীজী কুম্ভকোণমে *The Mission of the Vedanta* বক্তৃতায় বলেছিলেন, "It is here in India that Hindus have built and are still building churches for Christians and mosques for Mohammedans. That is the thing to do."[1] –"এই ভারতেই কেবল হিন্দুরা খ্রীষ্টানদের জন্য গির্জা ও মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করেছে এবং এখনও করছে। এমনটাই করতে হবে।"

ভারতবর্ষের এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায়, যখন আমাদের সুপ্রাচীন মাতৃভূমির সংহতি বিপন্ন, তখন এই সংহতি কেবল রক্ষা করা নয়, বরং তাকে কিভাবে আরও দৃঢ় করা যায়, তা জানা একান্ত প্রয়োজন। কেবল জানা নয়, সেই জ্ঞানকে কাজে রূপ দেওয়ার উপায় জেনে নিয়ে কাজে লেগে পড়া একান্ত আবশ্যক। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বর্তমান যুগে এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এযাবৎকাল, বিশেষ করে স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার প্রতি তেমনভাবে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ করিনি। তাঁর বাণীর 'বিশালতা' ও 'গভীর তাৎপর্য' সামগ্রিকভাবে বুঝতে জাতি হিসাবে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর ভূমিকা *Our Master and His Message* শেষ করেছিলেন এই বলে, "And some of us there are, who believe that not even yet has it been given to us to understand the vastness and significance

of the message that he spoke."[2] –"আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন, এখনও তাঁর বাণীর বিশালতা ও তাৎপর্য বুঝে ওঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।"

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা অনুসারে কিভাবে ভারতীয় জাতির সংহতি রক্ষা করা যায় ও তাকে দৃঢ়তর করা যায়, তা জানতে হলে আমাদের ভারতবর্ষ, ভারতের জাতীয় সংহতির মূল সূত্র এবং এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরী করা দরকার।

ভারতবর্ষ ও তার বৈশিষ্ট্য

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে –

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥"[3]

–"সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে যে ভূখণ্ড, তার নাম ভারত এবং তার সন্তানেরা (বা অধিবাসীরা) ভারতী (বা ভারতীয়) নামে অভিহিত।"

বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে এই পৃথিবী সাতটি দ্বীপে বিভক্ত ছিল – প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ও জম্বু –

"জম্বু-প্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥"[4]

এই সাতটি দ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ সর্বশ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপের যে বর্ষে অর্থাৎ যে অংশে ভরত রাজত্ব করতেন, সেই অংশকে বলা হয় ভারতবর্ষ। তাঁর আগে এই দেশের নাম ছিল অজনাভবর্ষ।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, স্বয়ম্ভুব মনুর বংশধর ছিলেন ঋষভ এবং ঋষভের একশজন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ভরত। তাঁরই নামে এদেশের নাম ভারতবর্ষ। সেখানে বলা হয়েছে –

"যেষাং খলু মহাযোগী ভরতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠগুণ
আসীদ্যেনেদং বর্ষং ভারতমিতি ব্যপদিশন্তি ॥"[৫]

– "তাঁদের (ঋষভের একশ পুত্রের) মধ্যে ভরত ছিলেন জ্যেষ্ঠ, সত্যই পরম গুণবান ও মহাযোগী। তাঁরই নাম অনুসারে এই ভূখণ্ডকে ভারতবর্ষ নামে অভিহিত করা হয়েছিল।" আর এই পুরাণের মতে এই সাতটি দ্বীপের মধ্যে পুণ্যভূমি হল ভারত –

"অহো ভুবঃ সপ্তসমুদ্রবত্যা দ্বীপেষু বর্ষেষ্বধিপুণ্যমেতৎ।"[6]

– "আহা, সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীর সব দ্বীপ ও বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ পুণ্যভূমি।"

ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে এক অনন্য দেশ। উত্তরে হিমালয়, উত্তর-পশ্চিমে সুলেমান ও হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণী, উত্তর-পূর্বে আরাকান পর্বত ও অন্যান্য গিরিমালা এবং দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্বদিকে যথাক্রমে ভারত মহাসাগর আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর ভারতকে ভৌগোলিক দিক থেকে অন্যান্য দেশগুলি থেকে দীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। অবশ্য মৌর্যযুগে (৩২৪-১৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ও মোগল শাসনকালে সামান্য কিছুকালের জন্য আফগানিস্তানের অনেকটা অঞ্চল রাজনৈতিকভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ ছেড়ে দিলে, অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রধানত দ্রাবিড়, মুণ্ডা ও

ভারতীয়-আর্য, আদিম পার্বত্য ও অরণ্যবাসী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, নানান মোঙ্গলীয় জাতিগোষ্ঠী প্রভৃতির বাসভূমি এই ভারতবর্ষ। এছাড়া গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ, পারসিক, আরব, আফগান, মোগল এবং আরও নানা জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে ভারতে এসেছে এবং ভারতীয় জনসমাজে মিশে গিয়ে এক মহাজাতিতে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগিজ, দিনেমার ও অন্যান্য জাতি ভারতবর্ষে এসেছে এবং ভারতের জাতীয় জীবনে ছাপ রেখে গেছে। ভারতের ভূভাগের বিশালতা, বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ, নানা ভাষা, আচার-অনুষ্ঠানের বিপুল বৈচিত্র্য, বিভিন্ন ধর্মমত, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিচিত্রতা – এসব কারণে ভারতবর্ষকে দেশ না বলে উপমহাদেশ বলা যায়। কেরলের মানুষের ভাষা, রীতিনীতির সঙ্গে কাশ্মীরের মানুষের ভাষা, রীতিনীতির পার্থক্য অনেক। তেমন অন্ধ্রপ্রদেশের অধিবাসীর সঙ্গে অরুণাচল প্রদেশের মানুষের দেহগঠন থেকে জীবনযাত্রার ধরণে বিস্তর পার্থক্য। সেজন্য ভাষা, আচার-আচরণ, বংশের মোটামুটি অভিন্নতা ইত্যাদি যে-সকল ভিত্তিতে ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতিকে দেশ বলা যায়, সেই অর্থে ভারতবর্ষকে দেশ বলা যায় না। বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিরাট চীনের সঙ্গেও ভারতের তুলনা করা যায় না। এজন্য কেউ কেউ ভারতবর্ষকে উপমহাদেশ না বলে মহাদেশ বলা সঙ্গত মনে করেন। প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম, ভাষা, জীবনযাপনের রীতিনীতি – সকল দিকে এই বৈচিত্র্যের জন্য

ভারতবর্ষকে 'epitome of the world' ('বিশ্বের সারাংশ') বলা হয়েছে। আর্নল্ড টয়েন্‌বী ভারতবর্ষ সম্পর্কে বলেছেন, "India is the whole world placed at close quarters." – "ছোট জায়গার মধ্যে সমগ্র জগৎটাকে ঢুকিয়ে দিলে যা হবে, ভারতবর্ষ হল তাই।"

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অসাধারণ *Aryans and Tamilians* (আর্য ও তামিল) প্রবন্ধে ভারতবর্ষ সম্পর্কে লিখেছেন, "A veritable ethnological museum ! Possibly, the half-ape skeleton of the recently discovered Sumatra link will be found on search here, too. The Dolmens are not wanting. Flint implements can be dug out almost anywhere. The lake-dwellers — at least the river-dwellers — must have been abundant at one time. The cave-men and leaf-wearers still persist. The primitive hunters living in forests are in evidence in various parts of the country. Then there are the more historical varieties — the Negrito-Kolarian, the Dravidian and the Aryan. To these have been added from time to time dashes of nearly all the known races, and a great many yet unknown — various breeds of Mongoloids, Mongols, Tartars, and the so-called Aryans of the philologists. Well, here are the Persian the Greek, the Yunchi, the Hun the Chin, the Scythian, and many more melted and fused, the Jews, Parsees

Arabs, Mongols, down to the descendants of the Vikings and the lords of the German forests yet undigested — an ocean of humanity, composed of these racewaves seething, boiling, struggling, constantly changing form rising to the surface and spreading and swallowing little ones, again subsiding — this is the history of India."[7]

– "সত্যই, এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়তো সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাবে। ডলমেনেরও অভাব নেই। চকমকি-পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়লেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। হ্রদ-অধিবাসীগণ, অন্ততঃ নদীতীরবাসিগণ – নিশ্চয়ই কোন কালে সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। গুহাবাসী এবং বৃক্ষপত্রপরিহিত মানুষ এখনও বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। এদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশসম্ভূত ও ভাষাতাত্ত্বিকগণের তথাকথিত আর্যদের নানা প্রশাখা-উপশাখা এসে মিলিত হয়। পারসীক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হূন, চীন, সীথিয়ান, – এমন অসংখ্য জাতি মিলে মিশে এক হয়ে গেছে ; ইহুদি, পারসীক, আরব, মঙ্গোলীয় থেকে আরম্ভ করে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি – যারা এখনও এখানে মিশে যায়নি – এই সব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত

বিপুল মানবসমুদ্র – যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল – ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করে আবার শান্ত হচ্ছে – এই হল ভারতবর্ষের ইতিহাস।"

ভারতবর্ষে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে নানা জাতির মানুষ এসেছে সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যেতে, রাজ্য অধিকার করে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে, অত্যাচারিত-বিতাড়িত হয়ে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে, নিজ নিজ ধর্ম প্রচার করতে, এমনকি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে। ভারতবর্ষ কাউকে প্রত্যাখ্যান করেনি, সকলকে আপনার করে নিয়ে এক মহাজাতি গঠন করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ভারতবর্ষের ইতিহাস* প্রবন্ধে ভারতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখেছেন, "পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।"[৪]

পিলু নানাবতী তাঁর বইয়ে লিখেছেন, আরব-মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে পারসীক জাতির একটি দল খোরাসান, খরমুজ, দিউ দ্বীপ হয়ে গুজরাটের সঞ্জনে পৌঁছায় ৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। স্থানীয় হিন্দু রাজা জদী রানা (যাদব রাণা) তাঁদের আশ্রয় দিয়ে জানতে চান, তাঁরা তাঁর কাছে কি চান। উত্তরে পারসীক শরণার্থীদলের মুখপাত্র হয়ে তাঁদের বৃদ্ধ পুরোহিত বলেন, তাঁরা তাঁদের জরথুস্ত্রীয় ধর্ম পালনে স্বাধীনতা চান, তাঁরা চান নিজেদের সন্তানদের তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও

রীতি অনুসারে লালনপালন করতে, আর চান কৃষিকাজ করার জন্য জমি, যাতে তাঁরা স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবন নির্বাহ করতে পারেন, এবং যাঁদের মধ্যে বাস করতে এসেছেন তাঁদের ওপর যাতে বোঝা হয়ে থাকতে না হয়। রাজা তাঁদের সব আবেদন মঞ্জুর করে জানতে চাইলেন, যে-দেশ তাঁদের আশ্রয় দিয়েছে, প্রতিদানে সে দেশের জন্য তাঁরা কি করবেন। বৃদ্ধ পুরোহিত এক বাটি দুধ আনতে বললেন। তাতে এক চামচ শর্করা মিশিয়ে গুলে ফেললেন এবং বাটিটি উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরে জানতে চাইলেন, কেউ দুধের মধ্যে কোনো শর্করা দেখতে পাচ্ছেন কিনা। সকলে অসম্মতি জানালে সেই বৃদ্ধ পারসীক পুরোহিত বললেন, "তোমাদের দুগ্ধরূপ মানবিক সৌহার্দ্যের মধ্যে এমন তুচ্ছ শর্করার মত হয়ে থাকতে চাই।"[৭]

এই হল ভারতবর্ষ, যেখানে সকল মানবগোষ্ঠী তার স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও ভারতীয় জাতির মহাসমুদ্রে লীন হয়ে থাকতে পারে, কারণ ভারতবর্ষের মাতৃ-হৃদয় জগতের সকল জাতির মানুষকে সস্নেহে সপ্রেমে আলিঙ্গন করেছে। এক কথায় সংশ্লেষ ও সমন্বয় ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের মূল কথা, এটাই তার বৈশিষ্ট্য, তার শক্তি, এ তার দুর্বলতা নয় – যদিও অনেকে তা মনে করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোতে আয়োজিত ধর্ম মহাসভার অধিবেশনে ভারতের এই সনাতন ঐতিহ্যকেই জগতের মানুষের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, যখন প্রথম দিন তিনি অভ্যর্থনার উত্তরে বলেছিলেন, "I am

proud to tell you that I belong to a religion in whose sacred language the Sanskrit, the word exclusion is untranslatable."[10] –"তোমাদের বলতে আমি গর্ববোধ করছি যে আমি এমন ধর্মভুক্ত, যার পবিত্র ভাষা সংস্কৃতে 'exclusion' শব্দটির অনুবাদ করা যায় না।" এজন্যই ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমানদের অত্যাচারে বিতাড়িত হয়ে ইহুদী জাতির একটি অংশ ভারতের কেরলে আশ্রয় নিতে পেরেছিল, জরথুস্ট্রের অনুগামীরা আশ্রয় নিতে পেরেছিল ভারতে – স্বামীজী সে কথাও বলেছিলেন প্রথমদিনের ভাষণে। এই গ্রহণের বার্তা, সমন্বয়ের বাণী, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন – এর মধ্যেই আছে ভারতের সার্থকতা। মৌর্য সম্রাট অশোক শিলালিপির মাধ্যমে শান্তি, প্রেম ও সহনশীলতার বাণী প্রচার করেছেন তাঁর সাম্রাজ্যের ভেতরে ও বাইরে, এমনকি গ্রীস, আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত। তাঁর একটি শিলালিপিতে লেখা হয়েছিল, "সমবায় এব সাধুঃ।" –"(ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে) বিভিন্নতার মধ্যে সমবায়, সঙ্গতি ও ঐক্য রক্ষা করাই মঙ্গলের পথ।" ভারতবর্ষের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে, অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা – বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"[11]

কি ছিল সেই মূল রহস্য, কি ছিল সেই রসায়ন, যা ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর ধরে এতো বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য স্থাপন করে রেখেছিল ? কোন সাধনবলে ভারত তার অখণ্ড-চেতনাকে রক্ষা করতে পেরেছিল ? রাষ্ট্রনৈতিক বা রাজনৈতিকভাবে এই ঐক্য সম্প্রতি কালের ব্রিটিশ শাসনের আগে কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করার সুযোগ পায়নি। একথা ঠিক যে, মৌর্য সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিমে তাসখণ্ড, আফগানিস্তান, বালুচিস্তান, পাঞ্জাব এবং দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; মোগল সাম্রাজ্যও কিছুকালের জন্য সমগ্র ভারত ভূখণ্ডের অনেকখানি অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু কোন যুগেই ভারতবর্ষে অখণ্ড রাষ্ট্রীয় ঐক্য বলবৎ হবার সুযোগ পায়নি। কেবল ব্রিটিশের ভারত অধিকারের পর বলা যায় সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার আগে নয়। কিন্তু যুগ যুগ ধরে এক অখণ্ড ভারতের চেতনা উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

ভারতীয় জাতির সংহতির রসায়ন

প্রাচীন ভারতে সাল-তারিখ-কাল ধরে, রাজাদের রাজত্বকাল ধরে খুব বেশী ইতিহাস লেখা হয়নি বলে অনেকে অভিযোগ করেন যে, ভারতীয়রা ইতিহাস লিখতে জানত না। ঐতিহাসিক জন ফেইথ্‌ফুল ফ্লীট (John Faithful Fleet) অভিযোগ করেছিলেন যে, হিন্দুদের ঐতিহাসিক বোধ ছিল না। ভারতে আগত বিখ্যাত পর্যটক অল্‌-বিরুনী (১১শ শতাব্দী) এমনও মন্তব্য করেছিলেন যে হিন্দুরা

ইতিহাস রচনার প্রতি উদাসীন, রাজাদের কালানুক্রমিক ইতিহাস সম্পর্কেও অজ্ঞ। কর্ণেল জেমস টড্ তাঁর *Annals and Antiquities of Rajasthan* বইটির প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, হিন্দুস্তানের ঐতিহাসিক প্রেরণার বন্ধ্যাদশা ইউরোপীয়দের কাছে এক বিরাট হতাশার কারণ – "Much disappointment has been felt in Europe at the sterility of historical muse of Hindustan."[12] কিন্তু রাজাদের রাজত্বকালের সালতামামির ইতিহাস অপ্রতুল হলেও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় তার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ভিতর দিয়ে – বেদ-উপনিষদ-পুরাণ-মহাকাব্যের মধ্য থেকে, যেখানে লৌকিক ঘটনাবলীর চেয়ে ভাবজগতের, গভীর চিন্তা ও উপলব্ধির ইতিহাস প্রাধান্য পেয়েছে।

ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন বেদ থেকে কিন্তু আমরা সে যুগের ভৌতিক, লৌকিক, জাগতিক অবস্থার কথাও জানতে পারি। তা থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারত জাগতিক দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত ছিল। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, শল্যবিদ্যা, শিল্পকলা, স্থাপত্য ইত্যাদি বিষয়ে সে যুগের তুলনায় অনেক উন্নতি হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে ভারতবর্ষ যথেষ্ট উন্নতি করেছিল, এক ধরণের গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাচীন ভারতে। এমনকি জাহাজও নির্মাণ হত এদেশে। ভারতের বাইরের দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে যোগাযোগও ছিল। এভাবে জাগতিক উন্নতি হলে উচ্চতর চিন্তা ও সৃজনশীলতার

অবকাশ মেলে। নৃতত্ত্বের চিন্তা অনুসারে আমরা জানি যখন কোনো জনগোষ্ঠী শিল্প ও কৃষির উন্নতির ফলে জাগতিক ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা লাভ করে, তখন তাদের জীবনে যে অবসর আসে, তারা সেই উদ্বৃত্ত অবসর প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদার ঊর্ধ্বে আন্তর জীবনের ক্ষেত্রে উপযোগ করার সুযোগ পায়। ফলে এক উন্নত সংস্কৃতির – আন্তর সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। এদেশে সেই সুদূর অতীতেই কিছু মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এই যে পরিবর্তনশীল জগৎ আর তার মধ্যে মরণশীল মানুষ, এই যে জন্ম, বৃদ্ধি, বিস্তার ও পরিণামে মৃত্যু – যা আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি – এটাই কি জীবনের শেষ কথা ? আমাদের সদা-পরিবর্তনশীল দেহমনই কি সত্য ? সদা-পরিবর্তনশীল এই জগৎই কি সত্য ? নাকি এ ছাড়াও কোনো পরিবর্তনীয় সত্তা আছে ? জীবনের অর্থ কি, এর উদ্দেশ্য কি ? জগৎ ও জীবনের মধ্যে সম্পর্কই বা কি ? পরিবর্তন বা মৃত্যুই কি চরম পরিণতি, পরম সত্য ? নাকি এই সদা পরিবর্তনশীল জীবন ও জগতের পিছনে অজানা কোনও অপরিবর্তনীয় অমৃত সত্তা আছে ? মানুষের মন ও ইন্দ্রিয় সর্বদা বহির্মুখ বলে এইসব প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান প্রথমে করা হল বাইরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে। কিন্তু সেখানে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। তখন তাদের মধ্যে কোনো কোনো জ্ঞানী বিবেকবান ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করে নিজ নিজ অন্তরে সেই সত্যের অনুসন্ধান করেন এবং দীর্ঘ সাধনার ফলে এই পরিবর্তনশীলতার পিছনে এক অপরিবর্তনীয় সত্তা আবিষ্কার করেন।

উপনিষদ এ বিষয়ে বর্ণনা করেছে –

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যাগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥"[13]

–"স্বয়ম্ভু (মন সহ) ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখী করে সৃষ্টি করে সেগুলিকে ত্রুটিপূর্ণ করেছেন। সেজন্য মানুষ বাহ্যবিষয়গুলি দেখে, অন্তর্নিহিত সত্তা আত্মাকে দেখে না। কোনও বিবেকবান প্রাজ্ঞ মানব অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছায় বাহ্য বিষয়গুলি থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে তাদের অন্তর্মুখী করেন এবং অন্তরের অমৃত সত্তাকে (আত্মাকে) উপলব্ধি করেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ ১২ই নভেম্বর ১৮৯৭ তারিখে লাহোরে প্রদত্ত *The Vedanta* বক্তৃতায় মানুষের এই সত্যানুসন্ধান – জীবনের গভীর সমস্যা সমাধানের অন্বেষণ সম্পর্কে বলেছিলেন, "The search began in the external, and man at first wanted to get answers for all the deep problems from outside nature.... The Indian mind got all that could be had from the external world, but it did not feel satisfied with that; it wanted to search further to dive into its own soul, and the final answer came."[14] –"অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল বাইরের জগতে। মানুষ প্রথমে বাইরের প্রকৃতি থেকে সব গভীর সমস্যার উত্তর পেতে চেয়েছিল ...। বাইরের জগৎ থেকে যা পাওয়া সম্ভব ছিল, ভারতীয় মন তা পেয়েছিল, কিন্তু তাতে সে

সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সমস্যার মীমাংসার জন্য সে আরও গভীরে অনুসন্ধান করতে চেয়েছিল, নিজ অন্তরে ডুব দিয়েছিল এবং অবশেষে চরম উত্তর পেয়েছিল।" উত্তর হল, একই 'সত্তা' এই বিশ্বজগতের সমস্ত কিছুর মধ্যেই ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে; তা কেবল বিশ্বজগতের সমস্ত কিছুর মধ্যেই নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করছে – তা নয়, এই সমগ্র সৃষ্টিকে অতিক্রম করেও আছে। তা অসীম-অনন্ত-অমৃত, সৎ-চিৎ-আনন্দ। তার অস্তিত্ব থেকেই সকলের অস্তিত্ব, তারই চৈতন্যে সকল চেতনা-জ্ঞান-প্রকাশ, তারই জন্য সকল আনন্দের অন্বেষণ, সকলের প্রতি প্রেমের প্রকাশ। এই সত্তাকেই বলে আত্মা বা ব্রহ্ম। আর সৃষ্ট জগতে মানুষই এক অনন্য সৃষ্টি, যে সমস্ত নশ্বরতা পরিবর্তনশীলতার মধ্যে থেকেও তার উপলব্ধি করতে পারে, নিজের জীবনে এই অমৃত-অবিনশ্বর-অপরিবর্তনীয় সত্তার বিকাশ করে প্রকাশিত করতে পারে, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে অনুস্যূত ঐক্যের ধারণা করতে পারে। এই বিশেষ আবিষ্কার ভারতের বৈশিষ্ট্য – এই মহা ঐক্যের অনুসন্ধান ও তার পরিণতির ইতিহাস উপনিষদ-সাহিত্যে নানা ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদ ঘোষণা করেছে –

"একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥"[15]

–"এক দেবসত্তা (ব্রহ্ম) সর্বপ্রাণীর অন্তরের গহনে অবস্থিত; তিনি সর্বব্যাপী ও সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা। তিনি সকল কর্মের অধিনায়ক, সর্বভূতের নিবাসস্থল। তিনি সাক্ষী (নির্লিপ্ত দ্রষ্টা),

চেতনার কারণ। তিনি অদ্বিতীয় ও সকল গুণের অতীত।"

সেজন্যই তো ভারতবর্ষ কেবল ভারতবাসীকে নয়, সকল বিশ্ববাসীকে অমৃতের সন্তান বলে সম্বোধন করেছিল – "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥"[16]

–"হে বিশ্ববাসী অমৃতের সন্তানগণ, হে দিব্যধামবাসিবৃন্দ, তোমরা সকলে (একথা) শ্রবণ কর।"

স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাই শিকাগো ধর্ম মহাসভায় *Paper on Hinduism* বক্তৃতায় বলেছিলেন, " 'Children of immortal bliss' – what a sweet, what a hopeful name! Allow me to call you, brethren, by that sweet name – heirs of immortal bliss.... Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss holy and perfect beings. Ye divinities on earth – sinners ! It is a sin to call a man so; it is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep; you are souls immortal, spirits free, blest and eternal; ye are not matter, ye are not bodies; matter is your servant, not you the servant of matter."[17]" "'অমৃতের পুত্র' – কী মধুর, কী আশার নাম ! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করতে চাই – তোমরা অমৃতের অধিকারী... তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী – পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্যভূমির দেবতা তোমরা – পাপী ! মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানুষের যথার্থ স্বরূপের ওপর এ মিথ্যা কলঙ্কারোপ। হে সিংহগণ, ওঠ এবং

তোমরা মেষ – এই ভ্রম দূর করে দাও : তোমরা অবিনশ্বর মুক্ত আত্মা, পবিত্র ও শাশ্বত। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও। জড় তোমাদের দাস তোমরা জড়ের দাস নও।"

মানুষের অন্তর্নিহিত এই বিরাট সত্তার (ব্রহ্ম-সত্তার) আবিষ্কার, এই মহাসাম্যের বাণীই বিশ্বসভ্যতায় ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান। এটিই ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনা, যথার্থ ধর্ম, যা ভারতবর্ষকে হাজার হাজার বছর ধরে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছিল। এই আধ্যাত্মিকতা এই ধর্মই ভারতীয় জাতির সম্মেলন ভূমি, ঐক্যের মূলমন্ত্র। ধর্মের এই মূল সত্য নানাভাবে নানা ধারায় নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মপথের মধ্য দিয়ে। এই জাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার মাধ্যমেই ভারতীয় জাতির সংহতি রক্ষা ও দৃঢ় করা সম্ভব। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ্ ভারতের সংহতির মূল শক্তিকে চিনতে না পারলেও স্বীকার করেছিলেন, "India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or by political suzerainty. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language dress, manners and sect."[18] – "নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষে একটা গভীর অন্তর্নিহিত মূলগত ঐক্য বিদ্যমান। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা বা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে যে ঐক্য সৃষ্টি হয়, তার চেয়ে এই ঐক্য অনেক বেশী গভীর। এই ঐক্য বংশ বর্ণ ভাষা পোষাক পরিচ্ছদ আচার-আচরণ ও সম্প্রদায়ের অগণিত ভিন্নতাকে অতিক্রম করে

বিরাজ করছে।"

নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক স্যার হার্বার্ট রিজলে (Herbert Risley), যিনি ১৯০১ সালের ভারতের সেন্সাস কমিশনার হিসাবে জনগণনার দায়িত্বে ছিলেন এবং ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ওপর গবেষণা করেছিলেন, তিনিও এই মত পোষণ করেছিলেন, "Beneath the manifold diversity of physical and social types, language, custom and religion which strikes the observer in India, there can still be discerned a certain... underlying uniformity of life from the Himalayas to Cape Comorin. There is in fact an Indian character, a general Indian personality which we cannot resolve into its component elements."[19]

– "দৈহিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য, ভাষা, প্রথা ও ধর্মের বহুবিধ ভিন্নতা – ভারতে যেগুলো কোনও পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে, সেসবের অন্তরালে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত জনজীবনের একটা নির্দিষ্ট, অন্তর্নিহিত অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবিকই একটা ভারতীয় চরিত্র, সর্বজনগত একটা ভারতীয় ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান, যাকে আর ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত বা বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব নয়।" হয়তো বিদেশী পণ্ডিত-গবেষকরা এই ভারতীয় চরিত্র, ভারতীয় ব্যক্তিত্বকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারেননি, কিন্তু সেই চরিত্র, ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার মাধ্যমে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের

পর ভারতবাসীকে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, "Our vigour, our strength, nay, our national life is in our religion."[20] – "আমাদের প্রাণশক্তি, আমাদের বল, এমনকি আমাদের জাতীয় জীবন আমাদের ধর্মে নিহিত।"

ভারতীয় জাতি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী – একই ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল বসবাসকারী বৃহৎ কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ভাষা, সাহিত্য, প্রথা, ধর্মাচরণ-প্রণালী ইত্যাদি থাকলেও – তারা একই ধরণের রাজনৈতিক ইতিহাসের অঙ্গ হওয়ার ফলে যদি তাদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান হতে থাকে, তা হলে সেই মানবগোষ্ঠীকে একটি 'জনসমাজ' (People) বলা যায়। জনসমাজে অধিকারবোধ ও অভিযোগের ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে যতক্ষণ একটা রাজনৈতিক চেতনা জেগে না উঠছে, তারা স্বাতন্ত্র্যকামী হয় না। এই অর্থে বহুকাল পর্যন্ত ভারতের মানবগোষ্ঠী 'ভারতীয় জনসমাজ' বা 'People of India' হিসাবে পরিচিত।

জনসমাজ (People) পরে জাতীয় জনসমাজে (Nationality) পরিণত হয় তখনই যখন কালক্রমে ইতিহাসগত ও রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠার ফলে তাদের মধ্যে এক দৃঢ় ঐক্যবন্ধন গড়ে ওঠে। এর ফলে তারা অন্য যে কোনো জনসমাজ (People) বা জাতীয় জনসমাজ (Nationality) থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করে। জাতির দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের (৮ম থেকে ১৭শ শতক) শেষাংশে, বিশেষ করে

মোগল আমলে (১৫২৬ - ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ) ও ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয়রা অনেকাংশে রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ঐক্য লাভ করে। গবেষকরা বলেন, তখন তাদের মধ্যে ইতিহাসগত ও রাজনৈতিক ঐক্য দৃঢ়ভাবে দানা বাঁধে এবং তারা এক পৃথক বা স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী বা জাতীয় জনসমাজ (nationality) হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করতে শুরু করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রান্সিস্ কোকার (Francis Coker) বলেছেন, "জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয় অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে।" – "Nationality is primarily a product of historical experiences and cultural tradition." অর্থাৎ যে ঐক্যের দৃঢ়তা ও স্বাতন্ত্রবোধ 'জনসমাজ' (People) স্তরে তেমন দানা বাঁধেনি, তা দৃঢ়তর হয়ে এই জাতীয় জনসমাজের (Nationality) পর্যায়ে মানবগোষ্ঠীকে পরিচালিত করে।

আর জাতি (Nation) হল একটি জনসমাজ, যা ক্রমবিকাশের মাধ্যমে সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছেছে। জাতীয় জনসমাজের (nationality) ঐক্যবোধ ও স্বাতন্ত্রবোধ আরও দৃঢ় হয়ে যখন পৃথক রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের দাবীতে পরিণত হয়, তখন তা জাতির (Nation) রূপ নেয়। জাতি তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য নিজস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। নিজস্ব পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে জাতীয় জনসমাজ তাদের নিজেদের পৃথক সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সাধন সার্বিকভাবে করতে পারবে – এই উপলব্ধি যখন তাদের হয়, তখন

তাদের রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব হয়েছে বলা হয়। অর্থাৎ পৃথক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন বা তার প্রাপ্তি – এই হল জাতীয় জনসমাজের জাতিতে উত্তরণ। তাই লর্ড ব্রাইসের (Lord Bryce) মতানুসারে জাতি হল, রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত বহিঃশাসন হতে মুক্ত অথবা মুক্তিকামী জাতীয় জনসমাজ – "...a nation is a nationality which has organized itself into a political body either independent or desiring to be independent."

এ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন ইংরেজ শাসনের শেষের দিকে, যখন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়, অথবা যখন ভারত ১৯৪৭ সালে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে, তখন ভারতীয়রা প্রকৃত অর্থে ভারতীয় জাতিতে (Indian Nation) উন্নীত হয়।

সংক্ষেপে বললে, একটি জনসমাজ বাহ্যিক ও ভাবগত নানা প্রভাবে প্রথমে জাতীয় জনসমাজে ও পরে ক্রমে জাতিতে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বাহ্যিক প্রভাবের গুরুত্ব থাকলেও ভাবগত ঐক্যই মুখ্য। যেমন, একই ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে (ভৌগোলিক সান্নিধ্যে) দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করার ফলে কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে একাত্মবোধের জন্ম নিতে পারে। তাদের বংশগত ঐক্য, ধর্মগত ঐক্য, অর্থনৈতিক সমস্বার্থ ও রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য (অর্থাৎ একই রাষ্টের শাসনাধীনে বসবাস) – এইসব কারণ থেকেও একাত্মবোধ আসতে পারে। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে এগুলি বাহ্যিক উপাদান এবং জাতীয়তাবোধ গঠনে এগুলির

কোনটিই এককভাবে অপরিহার্য নয়। তাঁদের মতে জনসমাজের মধ্যে ভাবগত বা মনোগত একাত্মবোধ – আমরা জাতি হিসাবে এক, প্রত্যেকে অপরের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, একের কল্যাণ জাতির অপর সকলের কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত – এই ভাবগত ঐক্য জাতীয় জনসমাজ বা জাতি গঠনের মূল উপাদান। অধ্যাপক আর্নেস্ট রেনাঁ (Ernest Renan) সেজন্য তাঁর *What is Nation?* শীর্ষক বিখ্যাত বক্তৃতায় বলেছেন, "A nation is a spiritual principle, the outcome of the profound complications of history; it is a spiritual family not a group determined by the shape of the earth. ...A nation is a soul, a spiritual principle."[২১] –"জাতি হল একটি ভাবগত তত্ত্ব, ইতিহাসের গভীর জটিলতার ফল। এটি একটি ভাবগত বা মনোগত পরিবার, ভূখণ্ডের আকার দ্বারা নির্ধারিত একটা দল বা গোষ্ঠী নয়। ...জাতি একটা সত্তা একটা আন্তরিক আত্মিক তত্ত্ব।"

এক শক্তিশালী স্বাধীন ভারতীয় জাতি গড়ে তোলার জন্য ভারতবাসীর এই আন্তর একত্ববোধকে ঐক্যবোধে উদ্বোধিত করার চেষ্টা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অসাধারণ রচনা *স্বদেশমন্ত্রের* মাধ্যমে।

তাঁর আহ্বান ছিল অখণ্ড ভারতের সকল নাগরিকের প্রতি – "হে ভারত, ...ভুলিও না – তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের – নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না – নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত তোমার

ভাই... সদর্পে বল – আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল – মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ... ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ...।"[22] বহু মানুষের ইচ্ছাশক্তির মিলনের মাধ্যমে জাতি শক্তি সংগ্রহ করে এবং এর পরিণতিতে জাতির সংহতি সম্ভব হয় –" ...to make a great future India, the whole secret lies in organization, accumulation of power, co-ordination of wills."[23] – "একচিত্ত হওয়াই সমাজগঠনের রহস্য।"

ভারতের জাতীয় সংহতির পথে বাধা

আমরা যে ভারতবর্ষের সংহতির কথা বলছি, তা হল সেই ভারতবর্ষ, যা দীর্ঘ সংগ্রাম ও বহু মানুষের আত্মত্যাগের ফলে ১৪ ও ১৫ই অগাস্টের মধ্যরাতে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়েছিল Indian Independence Act, 1947-এর বলে; তা হল সেই খণ্ডিত ভারতবর্ষ যা সেদিন রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছিল। তখন ৫৬৫টির মত ব্রিটিশ-পদানত দেশীয় রাজ্য ছিল, যাদের সে সময়ে ব্রিটিশ সরকার অধিকার দেয় ভারতীয় ইউনিয়ন বা পাকিস্তানে যোগ দেবার অথবা স্বাধীন থাকার। প্রায় সবগুলি রাজ্যই ক্রমে ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রায় ৪৫০ বছর পর্তুগীজ শাসনে থাকার পর ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরী, করাইকল, মাহে ও ইয়েমো ভারতের শাসনাধীনে আসে ১৯৬৩ সালে এবং চন্দননগর আসে ১৯৫৪ সালে। পরে ১৯৭৫ থেকে সিকিম ভারতের অন্যতম প্রদেশ

হিসাবে গণ্য হয়। অবশ্য বাস্তবে তৎকালীন জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু অংশ ভারতের নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় স্বাধীনতার পরে। ইতিহাসের জটিল গতিপথে যে ভারতরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, সেই ভারতের জাতীয় সংহতির সমস্যা ও সমাধান প্রসঙ্গেই এখানে আমরা আলোচনা করছি।

১) সংকীর্ণ মানসিকতা

ভারতবর্ষে ঋষিরা যে আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করেছিলেন, যার চূড়ান্ত প্রকাশ বেদান্তে, তা নানা ধারায় ধর্মীয় আচরণে অনুসৃত হয়ে সমাজ জীবনে প্রভাব ফেলেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই তত্ত্বকে কোনকালেই সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে প্রয়োগ করে সর্বগত করা হয়নি। বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে – যত দিন গেছে, ততই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষকে ও সকল শ্রেণীর নারীকে বৈদিক শাস্ত্রপাঠ ও অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে; তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিমেয় পুরুষেরা (বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্প্রদায়) দখল করেছিল শাস্ত্রপাঠ ও নানা ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের অধিকার। সেজন্য কালক্রমে সমাজ- জীবনে নানা বিভেদ, নানা অসাম্য দেখা দিয়েছে। স্বামীজী 'ভারতী পত্রিকা'র সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা ঘোষালকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত মত আছে, কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহাভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ

নিষ্কাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড-শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।"[25]

কালক্রমে এই সংকীর্ণতা এমন স্তরে পৌছায় যে, তথাকথিত বিদেশী ও বিদেশাগত ধর্মের সমস্ত মানুষকে 'ম্লেচ্ছ' বলে তাদের সংস্রব এড়িয়ে চলার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা করা হত। বিদেশযাত্রা নিষিদ্ধ হয়েছিল। বিস্তার যখন রুদ্ধ হয়, চলমানতা যখন স্তব্ধ হয়, তখন বদ্ধ-স্থবির সমাজের পচন শুরু হয়। এভাবে এই জাতি দুর্বল হতে শুরু করে। স্বামীজী তাই বলেছিলেন,"India's doom was sealed the very day they invented the word MLECH-CHHA and stopped from communion with others."[26] –"যেদিন 'ম্লেচ্ছ' শব্দটি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সংযোগ বন্ধ করা হয়েছে, সেদিন থেকেই ভারতের বিপর্যয় আরম্ভ হয়েছে।"

বিদেশীদের আগমনের ফলে বিদেশীভাবের প্রভাব যখন গভীরতর হতে শুরু হয়, পাশাপাশি ধর্মান্তরকরণও শুরু হয়, সমাজকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানুষকে আরও নানা বিধিনিষেধের বেড়াজালে, লোকাচারে বাঁধবার চেষ্টা করা হল, জাতিভেদপ্রথা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হল। বিভিন্ন ধর্ম- সম্প্রদায়ের পুরোহিতশ্রেণী, জমিদার, মহাজন প্রভৃতি সমাজের বিশেষ অধিকারভোগী গোষ্ঠীগুলি এই বিধিনিষেধ, বর্ণভেদপ্রথা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা ধরে রাখারও একটি সুযোগ পেয়েছিল। তারই পরিণামে সাধারণ

মানুষের ওপর – বিশেষ করে তথাকথিত নিম্নজাতির মানুষ ও নারীদের ওপর প্রবল অত্যাচার নেমে আসে। তাদের প্রতি ঘৃণা, অপমান, বঞ্চনা, শোষণ জাতির অন্তর্নিহিত সংহতির শক্তিকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করতে থাকে।

২) পৌরোহিত্যপ্রথা, জাতিভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা

ভারতের নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণ পৌরহিত্যপ্রথা, জাতিভেদপ্রথা ও তার পরিণতিস্বরূপ অস্পৃশ্যতা ভারতের সংহতি নষ্ট করার কারণগুলির অন্যতম। স্বামীজী বলেছেন, "Priestcraft is in its nature cruel and heartless. That is why religion goes down where priestcraft arises. Says the Vedanta, we must give up the idea of privilege then will religion come. Before that there is no religion at all."[27] – "পৌরোহিত্যপ্রথা স্বভাবতই নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন। সেজন্য যেখানেই পৌরোহিত্যপ্রথার উদ্ভব হয়, সেখানেই ধর্মের পতন হয়। বেদান্ত বলে, বিশেষ অধিকারের ধারণা আমাদের অবশ্যই ছাড়তে হবে, তা হলেই ধর্ম আসবে। তার আগে আদৌ কোনো ধর্ম থাকতে পারে না।" বর্তমান ভারতে প্রায় সমস্ত ধর্মেই এই পৌরোহিত্যপ্রথা নতুন রূপ নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। বর্ণভেদ প্রথা ভারতীয় জাতিকে নানা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে এখনও বিভক্ত করে চলেছে। স্বামীজী সতর্ক করেছিলেন বহু আগেই – "the idea of caste is the greatest dividing factor"[28] –"জাতিপ্রথার ধারণাটিই সব থেকে বড় বিভেদের কারণ।"

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ সালে গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "হিন্দুর ধর্ম... ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয় – ছুঁৎমার্গে; ... যারা এক টুকরা রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে ! যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করবে ? ছুঁৎমার্গ is a form of mental disease (একপ্রকার মানসিক ব্যাধি), সাবধান। *All expansion is life, all contraction is death. All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life.* He who loves lives, he who is selfish is dying.'[29] সর্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। সর্বপ্রকার প্রেমই বিস্তার, সর্বপ্রকার স্বার্থপরতাই সঙ্কোচন। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র নিয়ম। যে ভালবাসে, সে বেঁচে থাকে; যে স্বার্থপর সে তো মরেছে।"

৩) সম্পদের অসম বন্টন

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দেশের অর্থ-সম্পদ অল্প কিছু লোকের অধিকারে থাকে। ফলে অধিকাংশ মানুষ কোনমতে জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম যে অর্থের প্রয়োজন তা থেকে বঞ্চিত থাকে। শোষণ যখন চরমে ওঠে, তারা শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয়, এমনকি উপযুক্ত পরিধেয় বস্ত্র থেকেও বঞ্চিত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার অনেক আগেই – যুগ যুগ ধরে নিম্নজাতির প্রতি প্রবল ঘৃণা-অবজ্ঞা, শোষণ-উৎপীড়ন তাদের প্রায় নিঃসম্বল করে

ফেলেছিল। আধুনিক যুগে তার ওপর ধনতান্ত্রিক শোষণ যুক্ত হওয়ার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠল। এর ফলে শোষিত মানুষের মধ্যে এই ভাব সৃষ্টি হতে থাকল যে, বৃহত্তর জাতীয় জীবন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। ভারতের বঞ্চিত মানুষের নিদারুণ অবস্থা নিজের চোখে দেখে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে একটি চিঠিতে স্বামীজী লিখেছিলেন "They have no chance, no escape no way to climb up. The poor, the low, the sinner in India have no friends, no help – they cannot rise, try however they may. They sink lower and lower every day, they feel the blows showered upon them by a *cruel society* and they do not know whence the blow comes. They have forgotten that they too are men."[30] – "তাদের কোনো সুযোগ নেই, পালাবার কোনো পথ নেই ওপরে ওঠার কোনো রাস্তা নেই। ভারতবর্ষে গরীবদের, নিম্নশ্রেণীর লোকদের, পাপীদের কোনো বন্ধু নেই, কোনো সহায়তা নেই – তারা কখনও উন্নত হতে পারে না, তা তারা যতই চেষ্টা করুক। তারা দিন দিন ডুবছে। নিষ্ঠুর সমাজ যে তাদের আঘাত করছে, তার ব্যথা তারা অনুভব করছে, কিন্তু তারা জানে না কোথা থেকে সে আঘাত আসছে। তারাও যে মানুষ, সে কথা তারা ভুলে গেছে।"

৪) প্রতিক্রিয়া ও তার ফল

মানুষ হল গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। যে গোষ্ঠীর সে অন্তর্গত, তার সঙ্গে সে একটা ঐক্য অনুভব করে – তা পরিবার (family), বর্ণ

(Caste), কুল (Clan), উপজাতি (Tribe), ধর্মীয় সম্প্রদায় (denominational religion) ইত্যাদি যাই হোক না কেন – যাকে সমাজতাত্ত্বিকরা in group বলেন। ফলে কোন গোষ্ঠীর কোনো সদস্যের প্রতি যদি ঘৃণা, অপমান, অন্যায়-অবিচার করা হয় অথবা সমগ্র গোষ্ঠীর প্রতি সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক-শোষণ-অত্যাচার হয়, তবে সে গোষ্ঠী ক্ষোভে অন্যগোষ্ঠী (out group) বা বৃহত্তর জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। তারা মনে করে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যদি তারা পূর্ণ বা আংশিক স্বাধিকারও লাভ করে, তবে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বঞ্চনার অবসান ঘটবে। কখন কখন অপমান-অমর্যাদা থেকে তাদের মনে জন্ম নেয় ঈর্ষা, বিদ্বেষ, এমনকি প্রতিহিংসা, প্রতিশোধস্পৃহা। আবার গোষ্ঠীর এই মানসিকতাকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে চতুর ব্যক্তিরা ক্ষমতা, অর্থ ও বিশেষ সুবিধা অর্জন করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করে। এভাবেই দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে খণ্ডিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতবর্ষেও বিচ্ছিন্নতার এই মনোভাব আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি বা নানা বিভেদকামী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে এবং এখনও পাচ্ছে। কারণ বিচ্ছিন্নতার মূলে যে সমস্যা, তা এখনও আমাদের বোঝা হয়নি, মূলগত সমাধানের জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করা হয়নি।

বিহার ২০০০ সালে বিভক্ত হয়েছে বিহার ও ঝাড়খণ্ডে। কারণ ঝাড়খণ্ড মূল্যবান খনিজ পদার্থে পূর্ণ, অথচ অর্থনৈতিক অসম

বন্টনের ফলে এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী সমাজ তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত ছিল। এই নিয়ে ক্ষোভ ও অভিযোগের ফলে বিহার দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। একই রকম বঞ্চনার কারণে তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ভিন্ন প্রদেশ হলেই যে খারাপ, তা নয়, নানা কারণে প্রদেশের বিভাগ হতে পারে। কিন্তু বঞ্চনা যখন বিভেদের প্রবণতা তৈরীর মূলে কাজ করে, তখন সেটা চিন্তার বিষয়।

স্বামীজী আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা পূর্বোল্লিখিত চিঠিতে সাবধান করেছিলেন এই বলে, "No man, no nation, my son, can hate others and live...."[31] – "হে বৎস, কোনো ব্যক্তি বা কোনো জাতি অন্যদের ঘৃণা করে কখনও বেঁচে থাকতে পারে না।"

স্বামীজীর বলা কথাগুলি বারবার সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং তথাকথিত নিম্নজাতির প্রতি উচ্চবর্ণের ঘৃণার ফল হিসাবে দক্ষিণ ভারতে (তামিলনাড়ুতে) পি.ভি. রামস্বামী পেরিয়ার (১৮৭৯-১৯৭৩) বর্ণভেদপ্রথা ও হিন্দুধর্মকে অভিন্ন মনে করে সমগ্র হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, সমাজে প্রবল আলোড়ন তুলেছিলেন। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তার প্রভাবে শুধু মনুসংহিতা পোড়ান হয়নি, রামায়ণ পোড়ান হয়েছিল, দেবমূর্তি ভাঙ্গা হয়েছিল, পোড়ান হয়েছিল, মূর্তিকে জুতো দিয়ে মারা হয়েছিল। তাঁর চিন্তায় যুক্তিবাদের কাছে ঈশ্বর ধর্ম ইত্যাদি কেবল নিরর্থকই নয়, পরন্তু এসব সমাজকে

modern generation, out of them will come my workers. They will work out the whole problem like lions. I have formulated the idea and have given my life to it... They will spread from centre to centre, until we have covered the whole of India."[৬০] – "আধুনিক যুবসম্প্রদায়ের ওপর আমার ভরসা, তাদের মধ্যে থেকেই আমি কর্মী পাবো। সিংহবিক্রমে তারা সমগ্র সমস্যাটির সমাধান করবে। পরিকল্পনাটি আমি স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে তৈরী করে দিয়েছি এবং সেই উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছি।... (এবার) তারা কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়বে, যতক্ষণ না আমরা সমগ্র ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলতে পারি।"

সুতরাং ভারতীয় জাতির সংহতি রক্ষা করতে হলে প্রথমে এমন যুবদল সৃষ্টি করতে হবে, "যারা ভারতের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নরূপ একমাত্র কর্তব্যে মনপ্রাণ ঢেলে দিতে পারে।" এমন যুব সংগঠন চাই, যাদের সমগ্র আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্যই হবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবকদের এই কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, এজন্য তাদের 'চরিত্র গঠন' বা 'জীবন গঠন' এবং নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনের উপায় বলে দেওয়া, উৎসাহিত করা। বেদান্তের অভেদভাবে নিজেদের জীবন গঠনের চেষ্টার পাশাপাশি তারা অন্যান্য যুবক এবং দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে এই প্রাণপ্রদ শিক্ষা নিয়ে যাবে। তবেই ঠিক দিশায় লোকশিক্ষার কাজ শুরু হবে, ভারতীয় সংস্কৃতির অসাধারণ মূল্যবোধ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে ও ক্রমে ক্রমে দেশে ইতিবাচক 'কল্যাণকর শক্তিশালী জনমত' তৈরীর ভিত্তি

প্রস্তুত হবে। এই কাজ প্রথমে না করলে দেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব যাদের হাতে পড়বে, তারা অধিকাংশই সাধারণ মানুষের স্বার্থে ক্ষমতার সদ্ব্যবহারে উদাসীন থাকবে, লোভ, ক্ষমতালিপ্সা প্রভৃতি তাদের গ্রাস করবে, এ তো আমরা স্বাধীনতার পর থেকে দেখে আসছি।

৩) লৌকিক শিক্ষা

স্বামীজী জানতেন, বেদান্তের শিক্ষা অনুসারে মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে জাগানোর জন্য চরিত্র গঠনের কাজটিই জাতীয় জাগরণ ও সংহতির ভিত্তি প্রস্তুত করতে পারে, কিন্তু শুধু এই কাজটিই যথেষ্ট নয়। সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রামে লৌকিক বিদ্যার গুরুত্বও অপরিসীম। দরিদ্র জনসাধারণের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা না করলে, তাদের বৈষয়িক উন্নতি না ঘটালে, তাদের আত্ম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না করলে কখনও জাতি গঠিত হতে পারে না। এছাড়া, অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এবং সাধারণ শিক্ষার আলোটুকু থেকেও বঞ্চিত যে শ্রেণী, তাদের মধ্যে অতি সহজেই কৌশলী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিচ্ছিন্নতার বিষ ঢুকিয়ে দিতে পারে। তাই চরিত্র-গঠনের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এবং বাস্তবানুগ কার্যকরী শিক্ষা যুক্ত হলে তবেই তাকে সার্বিক শিক্ষা বলা চলে। এমন সার্বিক শিক্ষাই সমাজকে নানা ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখতে পারে।

স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা সার্বিক ও সংহত। বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে বহু আলোচনা করেছেন। বলেছেন,

ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হল ভারতবর্ষে, যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে এমন একটি জাতি তৈরী করা, যারা শুধু বর্ণে ও রক্তে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা ও বুদ্ধিতে ইংরেজ – "a class of persons Indian in colour and blood but English in tastes, in opinions, in morals, and in intellect"। ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভারতবাসী বিশ্বাস করতে শুরু করল যে, বেদ-উপনিষদ নিকৃষ্ট সাহিত্য, তাদের পূর্বপুরুষরা বিকৃত-মস্তিষ্ক। নিজেদের সংস্কৃতি ঐতিহ্য ধর্ম ইতিহাস সম্পর্কে 'শ্রদ্ধা' হারাল ভারতবাসী। এক নেতিবাচক মানসিকতা, হীনমন্যতা, শ্রদ্ধাহীনতা তাদের গ্রাস করল। তাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ যেন হয়ে উঠল এক অনুন্নত অসভ্য জাতির দেশ। ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইংরেজ শাসনের ফলে ইউরোপীয় নবজাগরণের যে ঢেউ এসেছিল ভারতবর্ষে, তার ফলে এবং ইউরোপীয় জাতির জাগতিক সমৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার বাহ্যিক আড়ম্বর দেখে ভারতবাসী যেন মুগ্ধ বিমূঢ় হয়ে গেল। তারা মনে করল, যা ভারতীয় তা-ই নিকৃষ্ট – ঘৃণার বস্তু, আর যা ইউরোপীয় তা-ই উন্নত। নির্বিচারে ইউরোপীয় সভ্যতা, ইউরোপীয় আচার আচরণের অন্ধ অনুকরণে মেতে উঠল ভারতবাসী। অনুকরণ একটা জাতিকে সভ্য ও সংহত করতে পারে না, বরং ক্রমশ তার অধঃপতন ঘটায়। কারণ একটা জাতি হিসাবে আত্মশ্রদ্ধার বোধ সেই জাতির মানুষগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখার প্রথম শর্ত।

স্বামীজী লাহোরে প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতায় বলেছিলেন, "...imitation is not civilization.... Imitation, cowardly imitation, never makes for progress. It is verily the sign of awful degradation in a man. Ay, when a man has begun to hate himself, then the last blow has come. When a man has begun to be ashamed of his ancestors, the end has come."[35] –"অনুকরণ সভ্যতার লক্ষণ নয়... অনুকরণ, কাপুরুষের মতো অনুকরণ কখনও উন্নতির কারণ হতে পারে না, বরং তা মানুষের ভয়ানক অধঃপতনের চিহ্ন। যখন মানুষ নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করে, তখন তার ওপর শেষ আঘাত এসেছে। যখন মানুষ নিজ পূর্বপুরুষদের বিষয়ে লজ্জা অনুভব করে, তখন তার বিনাশ শুরু হয়েছে।" এভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাবে ভারতীয় জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট হতে শুরু করল। পাশ্চাত্যের জড়বাদী ভাবধারার প্রভাবে অনেকের কাছে ভোগই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল, আর পরার্থপর অনেক মানুষ মনে করলেন ভারতের সকল সমস্যার সমাধান পাশ্চাত্যের জড়বাদী দর্শনেই নিহিত।

৬) জড়বাদী দর্শন

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে জড়বাদী দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) ও সাম্যবাদের (Communism) চিন্তাতরঙ্গ ভারতে প্রবেশ করে ও ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করে। নিপীড়িত শোষিত মানুষের সার্বিক মুক্তি –এর এই মহান

উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু মানুষ সেই তত্ত্বকে সাদরে গ্রহণ করলেন, যাঁরা নিজেদের যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক দাবী করতেন। তাঁরা মনে করলেন, কার্ল মার্কস ও লেনিনের তত্ত্ব প্রয়োগে সর্বহারাদের ন্যায্য অধিকার ও ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়ে ভারতের ইতিহাসে এক প্রগতিশীল অধ্যায়ের সূচনা করবেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, সম্পদের ও ক্ষমতার সমবন্টনের মাধ্যমে ভারতে এক সমাজতান্ত্রিক ও ক্রমে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শোষিত-উৎপীড়িত সাধারণ মানুষের জীবনে সমস্ত বৈষম্য অত্যাচার শোষণের অবসান ঘটবে। তাঁদের ধারণা ছিল যে, তাঁরা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার এক আলোক-বার্তা ভারতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু যে জড়বাদী দর্শনকে ভিত্তি করে এই সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলন হবে, সেই দর্শনের মূলতত্ত্বটি ভারতীয় জাতীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্রে – যথার্থ ধর্ম-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রবল আঘাত হানতে উদ্যত হল। কারণ মার্কসীয় মত অনুসারে সমাজের পরজীবী শ্রেণী, যারা সাধারণ মানুষকে শোষণ করে নিজেদের মুনাফা সংগ্রহ করে ক্ষমতা ও সম্পদ রক্ষা করে, তারা চিরকাল নিজেদের স্বার্থে অসাম্যের অবস্থাটাকে বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং সমাজের সমস্ত ব্যবস্থাকেই এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। ধর্মকেও তারা ব্যবহার করে শ্রমজীবী-মানুষকে শোষণ করার হাতিয়ার হিসাবে। পরশ্রমজীবীর স্বার্থ এমনভাবে ধর্মের আড়ালে গোপন থাকে যে, শোষিত মানুষ তা বুঝে উঠতে পারে না, বরং তারা মনে করে

ধর্মের নিয়মে ও ধর্মের নির্দেশেই তারা দুঃখভোগ করছে – বেদনাময় জীবন যাপন করছে; আর পরবর্তী জীবনে তারা এই দুঃখ বেদনার পুরস্কাররূপে অপার আনন্দময় জীবনের অধিকারী হবে। ধর্ম তাদের এমনভাব মোহগ্রস্ত করে! তারা যেন ধর্মের মাদকের দ্বারা নেশাগ্রস্ত ও আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (V. I. Lenin) তাঁর *The Attitude of the Workers' Party to Religion* প্রবন্ধে বলেছেন, "Religion is the opium of the people – this dictum by Marx is the corner-stone of the whole Marxist outlook on religion."[৩৬] –"ধর্ম হল জনসাধারণের আফিম – মার্ক্সের এই মন্তব্যই ধর্ম সম্পর্কে সমগ্র মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি।" কারণ কার্ল মার্কস নিজেই *A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right* প্রবন্ধের ভূমিকায় লিখেছেন – "*Religious* suffering is, at one and the same time, the *expression* of real suffering and a *protest* against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people."

"The abolition of religion as the *illusory* happiness of the people is the demand for their *real* happiness."[37]
– ধর্মীয় ক্লেশস্বীকার হল বাস্তব ক্লেশের প্রকাশ এবং একই সঙ্গে বাস্তব ক্লেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। ধর্ম হল নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, প্রাণহীন অবস্থার প্রাণ। ধর্ম হল

জনগণের জন্য আফিম। জনগণের মিথ্যা সুখ কল্পনার ধর্মকে লোপ করার মানে হল তাদের প্রকৃত সুখের দাবী করা।"

যারা মার্কসীয় তত্ত্বের অনুসরণে – বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়ার সৃষ্টির ফলে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে – ভারতে সেরকম বিপ্লবের সূচনা করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের কাছে ধর্ম একটি অযৌক্তিক কল্পনামাত্র, যার কোনো বাস্তবতা নেই। বরং তা মানবপ্রগতির পরিপন্থী। তাঁদের মতে "ধর্মের ইতিহাস হল বিজ্ঞানসম্মত চিন্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাস।"[১৪] এটা সত্য যে পাশ্চাত্যে ধর্ম প্রতিপদে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যথার্থ ধর্মের যে ইতিহাস, তা কখনই মার্কসবাদীদের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে না। তবুও এই চিন্তার প্রভাবে এক শ্রেণীর ভারতীয়, যাঁরা নিজেদের যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রগতিশীল বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে ভারতের ধর্ম-দর্শন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের বিষয়, সারবত্তাহীন কল্পকথা, শোষণের এক শক্তিশালী অস্ত্র। এই চিন্তার প্রভাব ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি ভারতীয়দের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নষ্ট করতে কম চেষ্টা করেনি। এই চেষ্টা জাতির আন্তর বন্ধনকে শিথিল করে দিয়েছিল অনেকখানি, কারণ যথার্থ ধর্মই ভারতীয় জাতির জীবন সংগীতের মূল সুর।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "Each nation, like each individual, has one theme in this life which is its centre,

the principal note *round which every other note comes to form the harmony....* In India, religious life forms the centre the keynote of the whole music of national life; and if any nation attempts to throw off its national vitality — the direction which has become its own through the transmission of centuries — that nation dies if it succeeds in the attempt. And, therefore, if you succeed in the attempt to throw off your religion and take up either politics, or society, or any other things as your centre, as the vitality of your national life, the result will be that you will become extinct."[39]

– "ব্যক্তির পক্ষে যেমন, প্রত্যেক জাতির পক্ষেও তেমনি জীবনের একটি মূল সুর আছে, যা তার কেন্দ্র-স্বরূপ। এই প্রধান সুরের সঙ্গে অন্যান্য প্রত্যেকটি সুর মিলিত হয়ে সমন্বয় সৃষ্টি করছে। ভারতবর্ষে ধর্মীয় জীবনই কেন্দ্র, জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর। আর কোনো জাতি যদি এই জাতীয় প্রাণশক্তি – শত শতাব্দীর মধ্য দিয়ে যে-দিকটি তার নিজস্ব হয়েছে, তা ত্যাগ করতে চেষ্টা করে এবং যদি এই চেষ্টা সফল হয়, তবে সেই জাতির মৃত্যু হয়। অতএব যদি তোমরা ধর্মকে পরিত্যাগের চেষ্টায় সফল হও এবং রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কোন কিছুকে তোমাদের কেন্দ্ররূপে, তোমাদের জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তিরূপে গ্রহণ কর, তবে তোমরা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

তবে একথা ভাবলে ভুল হবে যে, স্বামীজী সাধারণ মানুষের জীবনে জাগতিক উন্নতি বা জড়বাদী সভ্যতার প্রয়োজন অনুভব করেননি, কারণ "*some sort of materialism, toned down to our own requirements, would be a blessing to many of our brothers who are not yet ripe for the highest truths.*"[40] –"যারা এখনও উচ্চতম সত্যসমূহের অধিকারী হয়ে উঠতে পারেনি, আমাদের তেমন অনেক ভাইদের কাছে একপ্রকার জড়বাদ আশীর্বাদ স্বরূপ। তবে সেটিকে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনের উপযোগী করে নিতে হবে।"

৭) ধর্মীয় বিবাদ

বর্তমান ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতির অন্যতম প্রবল অন্তরায় ধর্মীয় বিবাদ – বিশেষ করে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব। অথচ এই ভারতবর্ষে বহুদিন ধরে বিভিন্ন ধরণের মানুষ একত্র মিলেমিশে বাস করে আসছে। কূর্মপুরাণে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

"ভারতে তু স্ত্রিয়ং পুংসো নানাবর্ণাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
নানা দেবার্চনা যুক্তা নানাকর্মানি কুর্বতে ॥"[41]

– ভারতে বসবাসকারী নানা বর্ণের স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা করে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।"

সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর থেকেই কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন জাতির (প্রধানত তুর্ক, আফগান ও মোঙ্গল জাতির) মুসলমানগণ ভারতে প্রবেশ করতে থাকে – ধর্মবিস্তার,

রাজ্য অধিকার সম্পদ লুঠ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে। ধর্মান্তরকরণ, যুদ্ধবিগ্রহ ও নানা ঘাত-প্রতিঘাত ঘটলেও কালক্রমে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে এই দুই জনগোষ্ঠির মিশ্রণ হতে থাকে। ফলে ভারতবর্ষে সামাজিক আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, চিত্রকলা, সঙ্গীত, স্থাপত্য, শাসন-প্রণালী, এমনকি ধর্ম এক সমন্বয়ী রূপ নিল। হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চললেও উভয় ধর্মের সাধারণ মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে ওঠে – অন্ততঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত – ইতিহাসের গবেষণা এ কথা বলে। শুধু তাই নয়, ভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম হলেও সুফি মতের সঙ্গে ভক্তিভাব ও বেদান্ত দর্শনের চিন্তার মিল দেখতে পেয়েছিল এই ভারতবর্ষ।[42]

একথা মনে রাখা দরকার, মুসলমানগণ সর্বদা বলপ্রয়োগে এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করেনি। নির্যাতিত সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে বিপুল সংখ্যায়। ইতিহাসের বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে স্বামীজী মুসলমানদের ভারত অধিকার সম্পর্কে দুদিক থেকে – ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থেকে বিচার করেছেন। মনে রাখতে হবে, এই সৃষ্ট জগতে অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ কিছুই হয় না। ভারতীয় সমাজ-জীবনে তাদের অবদান প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন, "Even to the Mohammedan Rule we owe that great blessing the destruction of exclusive privilege. The Rule was after all, not all bad; nothing is all bad and nothing is all good. The Mohammedan conquest of India

came as a salvation to the downtrodden, to the poor. That is why one-fifth of our people have become Mohammedans. It was not the sword that did it all. It would be the height of madness to think it was all the work of sword and fire."[43] –"এমনকি মুসলিম শাসন আমাদের কাছে একটি মহান আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিল – একচেটিয়া অধিকার-লোপ। তাদের শাসন যে সবটা খারাপ ছিল, তা নয়; কোনো কিছুই সম্পূর্ণ মন্দ বা সম্পূর্ণ ভাল হয় না। মুসলমানদের ভারত অধিকার দরিদ্র পদদলিতদের কাছে এসেছিল ত্রাতা রূপে। সেইজন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ মুসলমান হয়ে গিয়েছে। শুধু যে তরবারির জোরেই এটা হয়েছে, তা নয়। এ শুধু তরবারি ও আগুনের বলে হয়েছে – এটা ভাবা চরম পাগলামি।" বাংলায় স্বামী বিবেকানন্দের একটি অসাধারণ মৌলিক রচনা *বর্তমান ভারত*। বইটির 'মুসলমান অধিকার' অধ্যায়ে তিনি সংক্ষেপে ভারতে মুসলমান শাসনের গৌরবের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিভিন্ন লেখা, আলোচনা ও বক্তৃতায় বারবার এই কথাই পাওয়া যায় – ভারতবর্ষ যতটা হিন্দুদের, ততটা মুসলমানদের, ততটাই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সকলের। তারা সকলেই জীবন চর্যায় ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাণীবাহী।

স্বামীজীর শিষ্যা সিস্টার ক্রিস্টিন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, স্বামীজী বিশেষ করে মোগল শাসনের গৌরবময় দিকগুলি ছবির মতো বর্ণনা করেছেন তাঁদের কাছে। ক্রিস্টিন একবার লিখেছিলেন, "স্বামীজীর কাছে ভারতবর্ষ শুধু হিন্দুদের দেশ ছিল না – তাতে

সকলের স্থান ছিল। 'আমার মুসলমান ভাইয়েরা' – এই কথাটি তিনি প্রায়ই বলতেন। তাঁর এই মুসলমান ভাইদের সংস্কৃতি, ধর্মভাব, পৌরুষশক্তি প্রভৃতি গুণগুলিকে তিনি যেভাবে বুঝতেন এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, তা বিস্ময়কর। এই সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা ও একাত্মতার মনোভাবে খুব কম মুসলমানও স্বামীজীকে ছাড়িয়ে যেতে পারত।"[44] ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, "তাঁর সমগ্র অন্তরাত্মাই ছিল দেশমাতৃকার জ্বলন্ত মহাকাব্য...।" সেই মহাকাব্যে সমমর্যাদায় স্থান হত রাজপুতজাতির, শিখদের, মারাঠাদের, সাধুসন্তদের, মহীয়সী নারীদের সঙ্গে মুসলমানদের – হুমায়ুন, শের শাহ, আকবর, শাহজাহান প্রভৃতিদের। কথা প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামীজী একবার বলেছিলেন, "You see, I love our Mohammedans !"[45] – "দ্যাখো, আমাদের মুসলমানদের আমি ভালবাসি !" কারণ তিনি প্রত্যেক মানুষকে তার সবচেয়ে শক্তিশালী দিক থেকে বিচার করতে শিখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে –"this habit of seeing every people from their strongest aspect."[46]

৮) বিভাজন ও শাসন নীতি

ব্রিটিশ শাসনের 'বিভাজন ও শাসন' (Divide and Rule) নীতি – যেমন মর্লে-মিন্টো সংস্কার বিল ও এরকম আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ – ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে ফাটল ধরাতে শুরু করল। পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ-সন্দেহ-ভয়-বৈরিতা যেন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও হিংসার ঘটনা শুরু হয় যতটা না ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার কারণে, তার চাইতে বহুগুণে রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই থেকে। জমিদারের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষকের ক্ষোভকে

উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতার লড়াইয়ে নিপুণভাবে ব্যবহার করা হত, যার পিছনে ছিল ব্রিটিশ সরকারের মদত। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদভাব তেমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। মহাবিদ্রোহের পর থেকে ব্রিটিশের শাসনকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার কৌশল গ্রহণ করা হয়। বলতে বাধা নেই, আজও সেই একই বিভেদ-বিদ্বেষ-ঘৃণার রাজনীতি চলছে স্বাধীন ভারতবর্ষে – নিজ নিজ দলের বা গোষ্ঠীর ক্ষমতাকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে।

ব্রিটিশ সরকারের Secretary of State স্যার চার্লস উড (Sir Charles Wood) ভারতের ভাইসরয় লর্ড এলগিনকে (James Bruce) ১৮৬২ সালে লিখেছিলেন, "We have maintained our power in India by playing off one community against the other and we must continue to do so. Do all you can, therefore, to prevent all having a common feeling." – "ভারতবর্ষে এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে আমরা ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছি এবং সেটাই আমাদের করে যেতে হবে। অতএব সকলের মধ্যে সমভাব (সাধারণ অনুভূতি) আসার পথ বন্ধ করার জন্য আপনি যা পারেন, তাই করুন।" একই কথা ১৪ই জানুয়ারী, ১৮৮৭ তারিখের একটি চিঠিতে Secretary of State ভিস্কাউন্ট ক্রস্ (Viscount Cross) লিখেছিলেন গভর্নর জেনারেল ডাফরিনকে (Lord Dufferin) এবং পরবর্তী কালে জর্জ

হ্যামিল্টন (Lord George Francis Hamilton) লিখেছিলেন লর্ড নাথানিয়েল কার্জনকে (Lord George Nathaniel Carzon)।

এমনভাবে এবং আরও নানা কারণে ভারতের জাতীয় সংহতি এক গভীর সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা বর্তমান ভারতবর্ষে নানাভাবে তার প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। এই সঙ্কটের মুহূর্তে দেশবাসী ও সরকার যদি আন্তরিকভাবে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথে চলার চেষ্টা করে, তবেই এক সংহত গৌরবোজ্জ্বল ভারতবর্ষ গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু পরিতাপের বিষয় – স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষ স্বামীজীকে অনুসরণ করে চলার প্রয়োজন অনুভব করেনি। শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী বলেছিলেন, "People in the government do not know Swami Vivekananda well. They have not studied Swamiji's approach to these problems. But they invited me to become a member of National Integration Council. After attending two or three meetings, I never went back. It was mere talk. There was absolutely no integration coming out of the Council. Those who came and spoke there, spoke only through the mouth. They didn't have that feeling of oneness in their heart."[47] "সরকারের লোকজন স্বামী বিবেকানন্দকে ভালভাবে জানেন না। এইসব সমস্যাগুলির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কী ছিল, তা তারা অধ্যয়ন করেননি। কিন্তু তাঁরা আমায় জাতীয় সংহতি সংসদের সদস্য হবার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

দু-তিনটি সভায় যোগ দেবার পর আমি আর কখনও সেখানে যাইনি। সেখানে কেবল কথা হয় ! ঐ সংসদ থেকে কোন সংহতি তৈরী হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়, কারণ যারা সেখানে বক্তৃতা দিতে আসতেন, তাদের সব কেবল মুখের কথায় সীমাবদ্ধ ! তাদের হৃদয়ে সেই একত্বের অনুভূতি ছিল না।"

সমাধান সূত্র

১) বিবেকানন্দ – ঘনীভূত ভারতবর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ যৌবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শাস্ত্র – ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি আয়ত্ত করেছিলেন এবং তাঁর এই জ্ঞানান্বেষণের চেষ্টা তাঁর দেহান্তের দিন পর্যন্ত চলেছিল। যখন সবে কৈশোর পেরিয়েছেন, জীবনের গূঢ় প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে এবং তার সমাধান পেয়েছিলেন তাঁর অলোকসামান্য জীবনে। তাঁকে গুরুরূপে গ্রহণ করে তাঁর পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। জগৎকে শিক্ষা দেবার যে দায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর সে দায় মাথায় নিয়ে তিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন। ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন, চিনেছিলেন, তাকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তী-কালে আমেরিকা ইউরোপে গিয়েছিলেন ভারতবর্ষের সনাতন সত্য জগতের সামনে তুলে ধরতে, ভারত তথা সমগ্র জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে; মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্ত মিথ্যা ভেদের আবরণ সরিয়ে

দিতে, তাদের প্রকৃত ঐক্যের পথ দেখাতে, সর্বোপরি মানুষকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে। জগতের সামনে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এক 'সীমাহীন মানুষ' রূপে কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 'Truth is my God and universe is my country.'[48] রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী মারিয়া আরোকিয়াম কানাগা (Maria Arokiam Kanaga) তাঁর গবেষণাপত্রে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে লিখেছেন, "He was a builder of bridges, a destroyer of barriers — a man without frontiers."[49] – তিনি মানুষে মানুষে মিলনের সেতু বেঁধেছিলেন, তাদের সমস্ত গণ্ডী ভেঙেছিলেন – তিনি ছিলেন এক সীমাহীন মানুষ।" এই কারণে স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে ভারতের জাতীয় সংহতি সম্পর্কে এমন যুক্তিগ্রাহ্য ও অভ্রান্ত পথনির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

স্বামীজী দু'দিক দিয়ে জাতীয় সংহতি সমস্যাটি বিবেচনা করেছেন এবং সমাধানের উপায় নির্ধারণ করেছেন – একটি আন্তর দিক ও আরেকটি বাহ্যিক দিক; জীবনের এই দুটি দিকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে তিনি জাতীয় সংহতির উপায়গুলি নির্দেশ করেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন, "Two worlds are there in which we live, one the external, the other internal. Human progress has been made, from days of yore, almost in parallel lines along both these worlds."[50] – "আমরা দুটি জগতে বাস করি – বাইরের জগৎ ও ভিতরের জগৎ। অতি প্রাচীন কাল থেকে এই উভয় জগতেই প্রায় সমান্তরাল ধারায় মানুষের অগ্রগতি হয়েছে।"

তাছাড়া স্বামীজী নিজেই ছিলেন এক অখণ্ড সংহত ভারতের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তিনি নিজেও নিজেকে "condensed India"[51]

বলেছেন – "আমি ভারতের ঘনীভূত মূর্তি।"

পাশ্চাত্যের বুধমণ্ডলীর চোখে সে সময়ে ভারতবর্ষ ছিল এক অসভ্য বর্বর দেশ। স্বামী বিবেকানন্দের মুখে ভারতবর্ষের মহিমার কথা শোনার পর তাঁদের ধারণার পরিবর্তন হল; তাঁরা এই দেশকে সম্মানের আসনে বসালেন। বিশ্বজয়ী শ্বেতাঙ্গদের দেশে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্মানিত হওয়ার ফলে ভারতবাসীর মনে জাতি হিসাবে এক আত্মশ্রদ্ধা জাগ্রত হল। ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর স্বামীজী কলম্বো থেকে আলমোড়া, পূর্ব বাংলা থেকে পাঞ্জাবে জাতির উদ্দেশ্যে একের পর এক ভাষণ দিলেন – যা বাংলায় *ভারতে বিবেকানন্দ* ও ইংরেজীতে *Lectures from Colombo to Almora* বইটিতে প্রকাশিত হয়েছে। তখন এই মৃতপ্রায় জাতি যেন এক নবচেতনায় জেগে উঠল, এক অখণ্ড ভারতচেতনায় যেন নতুন করে পথ চলা শুরু হল। স্বামীজীর আবির্ভাবের ফলে তাঁর বাণীতে সঞ্জীবিত হয়ে ভারতের যে জাগরণ হয়েছিল, ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ তাঁর লেখা বিবেকানন্দ-জীবনীতে তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। যীশু খ্রীষ্টের আহ্বানে মৃত ল্যাজারাসের প্রাণ ফিরে পাওয়ার ঘটনার সঙ্গে তার তুলনা করে তিনি লিখেছেন –

"দেশের উপর দিয়া বহিয়া গেল এক বারি ও বহ্নির প্লাবন। সেই সঙ্গে আসিল আত্মার শক্তির নিকট, মানুষের মধ্যে যে ভগবান সুপ্ত আছে, তাঁহার নিকট এবং তাঁহার অসীম সম্ভাবনার নিকট, দুর্জয় এক আবেদন... ল্যাজারাসের সমাধি-পার্শ্বে দণ্ডায়মান যীশুর মতো প্রাচ্যের এই ঋষিকে উর্ধ্ববাহু অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি। মৃতকে

পুনর্জীবিত করিবার জন্য তিনি যে দেহভঙ্গী করিয়াছেন, তাহা হইতে শক্তি উৎসারিত হইয়া পড়িয়াছে।

"...সেদিন হইতে, এই অতিকায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ চলিতে লাগিল। বিবেকানন্দের মৃত্যুর তিন বৎসর বাদে তাঁহার বংশধরগণ যদি বাংলার বিদ্রোহ এবং তিলক ও গান্ধীর আন্দোলনের সূচনা প্রত্যক্ষ করেন, ভারত যদি আজ জনসাধারণের সংঘবদ্ধ কর্মের মধ্যে আপনার সুনির্দিষ্ট-অংশগ্রহণ করে, তবে তাহার জন্য সে প্রথম নাড়া পাইয়াছিল মাদ্রাজের সেই শক্তিময় আহ্বানেই : 'ল্যাজারাস, জাগ্রত হও'।"[52]

২) মানুষ গড়ার শিক্ষা ও জনমত গঠন

ভারতবর্ষের যা-কিছুই প্রাচীন, তার সবই বর্তমানে গ্রহণীয় হতে পারে না ঠিকই, কিন্তু এদেশের যে সুপ্রাচীন বেদান্ত-বিজ্ঞান মানুষের মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা (ব্রহ্মত্ব) আবিষ্কার করেছে, সেই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশের পথও খুঁজে পেয়েছে এবং সর্ব মানুষের আন্তর ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে, তার বার্তা সমাজের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে যাক এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সেই বার্তা কার্যকর হোক — এইটি স্বামীজী বিশেষ করে চেয়েছিলেন। তা হলে সমাজের সকল মানুষ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ভালবাসার এক অচ্ছেদ্য একত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এরই মধ্যে রয়েছে বেদান্তের ব্যাবহারিক প্রয়োগ। বেদান্তের মূল কথা – "the only central ideal of Vedanta is this oneness.... Everything is that one, the difference is in degree and not in kind."[53] –"বেদান্তের মূল

আদর্শ হল এই একত্ব... সমস্ত কিছু হল সেই এক। পার্থক্য কেবল প্রকাশের মাত্রায়, প্রকৃতিতে নয়।"

মানুষ তার এই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশের চেষ্টা করলে ধীরে ধীরে তার মধ্যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা, সততা, পবিত্রতা, স্বাধীনতাবোধ, বিচারক্ষমতা, স্বার্থশূন্যতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ ঘটে। মূল্যবোধ জিনিসটা বস্তুগত (material) কিছু নয়, তার উৎস মানুষের আন্তর সত্তায় – অস্তিত্ব-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ সত্তায়। এই মূল্যবোধের বিকাশই হল 'চরিত্রগঠন' বা যথার্থ মানুষ হওয়া। সুতরাং চরিত্রগঠন ও প্রকৃত ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নেই। দেশের নাগরিক যদি চরিত্রবান না হয়, তবে জাতীয় সংহতি সম্ভব নয়। স্বামীজী খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, "the basis of all systems, social or political, rests upon the goodness of man. No nation is great or good because Parliament enacts this or that, but because its men are great and good."[54] – "সামাজিক রাজনৈতিক – সকল ব্যবস্থার ভিত্তি মানুষের সদ্‌গুণ। কোন জাতি এইজন্য মহান হয় না যে পার্লামেন্ট নানারকম আইন করে, বরং এইজন্য হয় যে সেই জাতির মানুষগুলি মহান।" কারণ সমাজ ও জাতি ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র।

বেদান্তের শিক্ষা সমাজে কি ধরণের মানুষ তৈরী করবে, যা ব্যক্তি ও সমাজকে এক সুন্দর সংহত রূপ দিতে সমর্থ ? স্বামীজীর কথায়, "What we want is to see the man who is harmoniously developed... great in heart, great in mind,

[great in deed]... we want the man whose heart feels intensely the miseries and sorrows of the world. And [we want] the man who not only can feel but can find the meaning of things, who delves deeply into the heart of nature and understanding. [We want] the man who will not even stop there, [but] who wants to work out [the feeling and meaning by actual deeds.] Such a combination of head, heart, and hand is what we want."[৫৫] – "আমরা এমন মানুষ দেখতে চাই, যিনি সুসমঞ্জসভাবে সব দিক থেকে উন্নত – উদারহৃদয়, উন্নতমনা ও কর্মনিপুণ। আমরা চাই এমন মানুষ, যাঁর হৃদয় জগতের দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা তীব্রভাবে অনুভব করে... আমরা চাই এমন মানুষ, যিনি কেবল অনুভব করতে পারেন তা নয়, বরং সকল বিষয়ের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেন, প্রকৃতি ও বোধের মর্মস্থলে গভীরভাবে ডুব দিতে পারেন। আমরা চাই এমন মানুষ, যিনি সেখানেও থেমে থাকেন না, যিনি চান হৃদয়ানুভূতি ও মর্মার্থবোধকে বাস্তব কর্মে রূপ দিতে। মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হাত – এই তিনটির এমন সমন্বয় আমরা চাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে ব্রত কি ছিল তা বলতে গিয়েও স্বামীজী এমন চরিত্র তৈরী করার কথাই বলেছেন *My Master* শীর্ষক একটি অসাধারণ বক্তৃতায়, "His hard-earned jewels of spirituality, for which he had given three-quarters of his life, were now ready to be given to humanity, and then

began his mission : First make character — that is the highest duty you can perform."[56] – "জীবনের তিন-চতুর্থাংশ ব্যয় করে যে আধ্যাত্মিক রত্নরাজি তিনি অর্জন করছিলেন, তা এবার মানবজাতিকে দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন শুরু হল তাঁর মহান ব্রত : প্রথমে চরিত্র গঠন কর – যা-কিছু তুমি করতে পারো, তার মধ্যে ঐটি হল উচ্চতম কর্তব্য।" চরিত্র গঠনের শিক্ষা হল জাতীয় সংহতির প্রথম ধাপ ও ভিত্তি।

দ্বিতীয় কাজ হল জনমত গড়ে তোলা। অধ্যাপক আবিদ হুসেন তাঁর *The National Culture of India* বইটির শেষ অধ্যায়ে এখনও ভারতবর্ষে যে পক্ষপাত, অসাম্য, অবিচার রয়ে গেছে, তার মূলোচ্ছেদ করার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সংস্কার ও উন্নতির জন্য সাধারণ সূত্র হিসাবে তিনি তিনটি ধাপের উল্লেখ করেছেন। প্রথম ধাপ – "First individual advocates and institutions of social reform should prepare public opinion for the desired change."[57] – "প্রথমত, পরিবর্তনের সমর্থক প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সমাজ-সংস্কার প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত অভিপ্রেত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জনমত তৈরী করা।"

স্বামী বিবেকানন্দ অনেক আগেই একথা বলেছিলেন। প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে 'কল্যাণকর শক্তিশালী জনমত' গঠন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশবাসীকে – সমগ্র জাতির সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে। সেই জনমত গঠনের প্রক্রিয়া কি হবে, কারা এ কাজে

অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে – তার একটি যুক্তিসঙ্গত রূপরেখাও দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ যদি দেশের ভাগ্যনির্ধারণ করতে সক্ষম না হয়, যদি গুটিকতক মানুষের হাতেই সেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে তবে তার ফল কখনও কল্যাণকর হতে পারে না। তাঁর মাদ্রাজ শহরে ৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭-এ প্রদত্ত *My Plan of Campaign* বক্তৃতায় বলেছিলেন, "There is, then, another great consideration. Here in India we have always been governed by kings; kings have made all our laws. Now the kings are gone and there is no one left to make a move. The Government dare not; it has to fashion its ways according to the growth of public opinion. *It takes time, quite a long time, to make a healthy, strong, public opinion which will solve its own problems; and in the interim we shall have to wait.* The whole problem of social reform, therefore, resolves itself into this : where are those who want reform ? *Make them first.* Where are the people ? The tyranny of a minority is the worst tyranny that the world ever sees. A few men who think that certain things are evil will not make a nation move. Why does not the nation move ? *First educate the nation, create your legislative body, and then the law will be forthcoming. First create the power, the sanction from which the law will spring.* The

kings are gone; where is the new sanction, the new power of the people ? Bring it up. Therefore, even for social reform, *the first duty is to educate the people*, and you will have to wait till that time comes."[58] এরপর আর একটি গুরুতর বিষয় বিবেচনা করতে হবে। এখানে – ভারতে আমরা বরাবর রাজশাসনাধীনে কাটিয়েছি; রাজারাই চিরদিন আমাদের সমস্ত বিধান প্রণয়ন করেছেন। এখন রাজারা নেই, আর এই বিষয়ে এগিয়ে আসার মতও কেউ নেই। সরকার সাহস করে না। সরকারকে জনমতের গতিপ্রকৃতি দেখে নিজ কার্যপ্রণালী স্থির করতে হয়। কিন্তু নিজেদের সমস্যাপূরণে সমর্থ, কল্যাণকর, শক্তিশালী জনমত গঠিত হতে সময় লাগে। এমন জনমত গঠিত হবার আগে পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং সমাজসংস্কারের সমগ্র সমস্যাটি এইরকম দাঁড়ায় – সংস্কার যারা চায়, তারা কোথায় ? আগে তাদের তৈরী কর। জনসাধারণ কোথায় ? অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যদি জোর করে অপর সকলের ওপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাবার চেষ্টা করেন, তা তো অত্যাচার ! এর মতো প্রবল অত্যাচার পৃথিবীতে আর নেই। অল্প কয়েকজন লোকের কাছে কতকগুলো বিষয় দোষযুক্ত মনে হলেই তা সমগ্র জাতিকে নাড়া দেয় না। সমগ্র জাতি নড়ে-চড়ে না কেন ? প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, বিধান-প্রণয়নে সমর্থ একটি ব্যবস্থা তৈরী কর; বিধান আপনাআপনি আসবে। প্রথমে যে শক্তিবলে – যার অনুমোদনে বিধান তৈরী হবে, তা সৃষ্টি কর। এখন রাজারা নেই; অনুমোদনের যে নতুন

লোকশক্তি, তা কোথায় ? প্রথমে সেইটে গঠন কর। সুতরাং সমাজসংস্কারের জন্যও প্রথম কর্তব্য হল জনসাধারণকে শিক্ষিত করা। এই কাজ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল – শিক্ষার মাধ্যমে বেদান্তের 'মনুষ্যত্ব-উন্মেষক' সাধারণ সত্যগুলি দেশের সকল প্রান্তে সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যাক। আর এটাই হবে এক সংহত জাতি গঠনের প্রথম পদক্ষেপ। মাদ্রাজেই *The Future of India* বক্তৃতায় সেই কথা বললেন, "What we want is to bring out these life-giving common principles of our religion, and let every man, woman, and child, throughout the length and breadth of this country, understand them, know them, and try to bring them out in their lives. This is the first step; and, therefore it has to be done."[59] – "আমরা আমাদের ধর্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বগুলিকে সকলের কাছে নিয়ে যেতে চাই, যাতে এই দেশের সর্বত্র আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে সেগুলি জানে, বোঝে আর নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে। এটি হল প্রথম পদক্ষেপ, সুতরাং এটা করতেই হবে।" কিন্তু কারা একাজে অগ্রণী সৈনিকের ভূমিকা পালন করবে ? যুবকেরা, যারা নিজের জীবনের মূল্য বোঝে ও সেই সঙ্গে অগণিত নিরন্ন, নিরাবরণ, আশ্রয়হীন, চিকিৎসাহীন, অপমানিত শোষিত দেশবাসীর জন্য যাদের হৃদয় কাঁদে। স্বামীজী যুবসম্প্রদায়ের ওপর এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন – "My faith is in the younger generation, the

বিভ্রান্ত করে। তাঁর কথায় : "the two things that render people irrational are god and religion."[32] – "দুটি জিনিস যা জনসাধারণকে যুক্তিহীন করে তোলে, তা হল ঈশ্বর ও ধর্ম।" তাঁর অভিমত ছিল – "God and religion are confusing society."[33] – "ঈশ্বর ও ধর্ম সমস্ত সমাজকে বিভ্রান্ত করে তুলছে।" প্রায় এই একই কারণে ১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৬ ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকার (১৮৯১-১৯৫৬) তাঁর ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার দলিত অনুগামীকে নিয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।

ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর ছুঁৎমার্গ ও তার পরিণতিস্বরূপ চরম অমর্যাদার কারণে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "Because we have the misfortune of calling ourselves Hindus, we are treated thus.... If we were members of another Faith, none would dare treat us so. ... I had the misfortune of being born with stigma of an Untouchable. However it is not my fault ; but I will not die a Hindu, for this is in my power."[34] – "দুর্ভাগ্যবশত যেহেতু হিন্দু বলে আমাদের নিজেদের পরিচয় দিতে হয়, তাই আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়। যদি আমরা অন্য ধর্মবিশ্বাসের মানুষ হতাম, তা হলে কেউ আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করার সাহস করত না। দুর্ভাগ্যবশত একজন অস্পৃশ্য মানুষ হওয়ার কলঙ্ক নিয়ে আমাকে জন্ম নিতে হয়েছিল। তাতে অবশ্য আমার দোষ ছিল না। কিন্তু হিন্দু পরিচয় নিয়ে আমি মরব না, কারণ এটা আমার সাধ্যের মধ্যে।"

অস্পৃশ্যতা, অপমান, জাতির অবান্তর বিভাগ জাতিকে দুর্বল করে তার সংহতি নষ্ট করে, ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নষ্ট করে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এগুলো সামাজিক সমস্যা, যথার্থ ধর্মের সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। স্বামীজী বারবার এ বিষয়ে বলেছিলেন এবং জাতিকে সতর্ক করেছিলেন।

৫) পাশ্চাত্য শিক্ষা

ভারতবর্ষের যে ধর্ম, যে সংস্কৃতি তার ঐক্য ধরে রেখেছিল, তা চরম আঘাত পেল ব্রিটিশ শাসনের সময়ে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক লর্ড থমাস্ বেবিংটন মেকলে (Thomas Babington Macaulay) ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫-এ Minute on Indian Education পেশ করেন, যা পরের মার্চ মাসে সরকারীভাবে গৃহীত হয়। তিনি চাইলেন, সরকার যেন ভারতে কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যয় করে, প্রাচ্যের শিক্ষার জন্য নয়। তিনি এও প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্য বিষয় ও দর্শন পড়ানো হলে তা যেন অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ তাঁর মতে "a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia." –"একটা ভাল ইউরোপীয় গ্রন্থাগারের এক তাক বইয়ের মূল্য ভারত ও আরবের সমগ্র দেশীয় সাহিত্যের সমতুল্য।" তাঁর বিশ্বাস ছিল, সংস্কৃত ভাষায় লেখা সমস্ত বই থেকে যে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যাবে, তা ইংল্যাণ্ডের প্রাথমিক স্কুলে ব্যবহৃত অতি তুচ্ছ ও সংক্ষিপ্ত বই থেকে পাওয়া তথ্যের থেকেও অনেক নিকৃষ্ট।

এমন শিক্ষা চাই যার মধ্যে চরিত্রগঠনের পাশাপাশি থাকবে বিজ্ঞানশিক্ষা, ভাষা ইতিহাস ভূগোল জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান, সঙ্গে কারীগরী ও অন্যান্য দক্ষতার প্রশিক্ষণ, যাতে সাধারণ মানুষ ছোট-বড় নানারকম ব্যবসা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ বা শিল্পস্থাপন করতে পারে অথবা আধুনিক শিল্পের কর্মী হিসেবে উপযুক্তরূপে গড়ে ওঠে। ঠিক কি ধরণের বিষয় শেখাতে হবে, সে সম্পর্কে স্বামীজী তাঁর বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে বলেছিলেন, "আমাদের চাই কি জানিস ? – স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর science (বিজ্ঞান) পড়ানো; চাই technical education (কারিগরি শিক্ষা), চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না ক'রে দু-পয়সা ক'রে খেতে পারে।"[61]

সেইটুকুই শুধু নয়, তাদের স্বাধীন চিন্তা করতে শেখাতে হবে। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তাসম্পদের পাশাপাশি বিশেষ করে তাদের জানাতে হবে – অন্যান্য জাতি কিভাবে এগিয়ে চলেছে, যাতে তারা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়। নারী ও পুরুষ – উভয়ের জন্যই স্বামীজীর এই সমন্বয়ী শিক্ষাচিন্তা। একটি চিঠিতে তিনি তাঁর অনুগামী যুবকদের লিখেছেন – "My idea is to bring to the door of the meanest, the poorest, the noble ideas that the human race has developed both in and out of India, and let them think for themselves....

"...any man, or class, or caste, or nation, or instituion

which bars the power of free thought and action of an individual — even so long as that power does not injure others — is devilish and must go down....

"My whole ambition in life is to set in motion a machinery which will bring noble ideas to the door of everybody, and then let men and women settle their own fate. Let them know what our forefathers as well as other nations have thought on the most momentous questions of life. *Let them see specially what others are doing now, and then decide.*"[62]

– আমার পরিকল্পনা হল – ভারতে বা বিদেশে মানবজাতি যেসব উন্নত চিন্তা করেছে সেগুলিকে হীনতম দীনতম মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া এবং তারপর তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদেরই ভাবতে দেওয়া।... কোনো ব্যক্তি, শ্রেণী, বর্ণ, জাতি বা প্রথা যদি ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও কাজের অধিকার কেড়ে নেয়, সেই স্বাধীনতা অপরের ক্ষতির কারণ না হলেও – তবে তা শয়তানি এবং তার পতন অনিবার্য।... আমার সমগ্র জীবনের স্বপ্ন এমন একটি যন্ত্র চালু করা, যা সকলের দ্বারে দ্বারে মহৎ ভাবরাজি নিয়ে যাবে। তারপর সকল নরনারী নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করুক। তারা জানুক, আমাদের পূর্বপুরুষেরা ও অন্যান্য জাতি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি নিয়ে কি ভেবেছেন। বিশেষ করে, তারা জানুক অন্যান্য জাতি বর্তমানে কি করছে, আর তারপর তারা কি করবে, তারাই সিদ্ধান্ত নিক।"

ঐ চিঠিতেই তাদের আহ্বান করে লিখেছিলেন, "Remember that the nation lives in the cottage. But, alas! nobody ever did anything for them.... Can you raise them ? Can you give them back their lost individuality without making them lose their innate spiritual nature? This is to be done and we will do it. You are born to do it.... Onward for ever ! Sympathy for the poor, the downtrodden even unto death – this is our motto."[63] –"মনে রেখো, দরিদ্রের কুটীরেই জাতীয় জীবন স্পন্দিত হচ্ছে, কিন্তু, হায় ! কেউই কোনোদিন তাদের জন্য কিছু করেনি... তাদের উন্নত করতে পারো ? তাদের সহজাত আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করে তাদের হারানো ব্যক্তিত্ববোধ ফিরিয়ে দিতে পারো কি ?... এটিই করতে হবে এবং আমরা এটি করবই। তোমরা এটি করবার জন্য জন্মেছ।... সর্বদা এগিয়ে যাও। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত গরীব ও পদদলিতদের জন্য সহানুভূতি – এটিই আমাদের মূলমন্ত্র।"

অর্থনৈতিকভাবে জাতিকে স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভর করতে না পারলে জাতীয় সংহতি রক্ষা সম্ভব নয়। কেবল অনুদান বা ভাতা দিয়ে জাতিকে স্বনির্ভর করা যায় না। তাঁর *বর্তমান ভারত* গ্রন্থে এই বিষয়ে অতি পরিষ্কার করে বলেছিলেন, "হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ পায়। সর্ব বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূর্তি

হয় না। সর্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। ঐ 'পালিত' 'রক্ষিত'ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল।"[64]

কিন্তু স্বামীজী জানতেন ভারতের মতো দরিদ্র দেশে সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও দরিদ্র ছাত্র জীবনরক্ষার তাগিদে উপার্জন ছেড়ে বিদ্যালয়ে আসবে না। তাই তাঁর প্রস্তাব – সেক্ষেত্রে শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে হবে শিক্ষার্থীর দ্বারপ্রান্তে। ১৯০০ সালের ২৭শে জানুয়ারী প্যাসাডেনায় শেক্সপীয়ার ক্লাবে দেওয়া *My Life and Mission* বক্তৃতায় এ বিষয়ে যে কথা বলেছিলেন, তা আজও সমানভাবে প্রযোজ্য – "My plans are, therefore, to reach these masses of India. Suppose you start schools all over India for the poor, still you cannot educate them. How can you ? The boy of four years would better go to the plough or to work, than to your school. It is impossible. Self-preservation is the first instinct. But if the mountain does not go to Mohammed, then Mohammed can come to the mountain. Why should not education go from door to door, say 1. If a ploughman's boy cannot come to education, why not meet him at the plough, at the factory, just wherever he is ? Go along with him, like his shadow."[65] – "অতএব আমার পরিকল্পনা হল ভারতের জনগণের কাছে পৌঁছানো। ধরুন আপনি সমগ্র ভারতবর্ষে দরিদ্রদের জন্য স্কুল

খুলতে শুরু করলেন, তাও আপনি তাদের শিক্ষিত করতে পারবেন না। কেমন করে পারবেন ? চার বছরের বালক আপনাদের স্কুলে যাবার চেয়ে বরং লাঙল ধরতে বা অন্য কাজ করতে যাবে। কারণ এটা তার পক্ষে অসম্ভব। জীবন বাঁচানোই প্রথম সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু যদি পর্বত মহম্মদের কাছে না যায়, মহম্মদই পর্বতের কাছে আসতে পারে। আমি বলি, শিক্ষা কেন দ্বারে দ্বারে যাবে না ? যদি কৃষকের ছেলে শিক্ষার কাছে আসতে না পারে, তা হলে কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায় – যেখানে সে আছে, সেখানেই শিক্ষাকে কেন পৌঁছে দেওয়া যাবে না ? ছায়ার মতো তার সঙ্গে যেতে হবে।" আবার, তাঁর সময়ের উপযোগী করে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল – মানচিত্র, গ্লোব, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি সামগ্রী নিয়ে সেখানে পৌঁছে যাওয়া, যেখানে সব কাজ সেরে দিনের শেষে গ্রামের মানুষ জড়ো হয়। সেখানেই মুখে মুখে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, যাতে তাদের বৈষয়িক উন্নতিতে সহায়তা হয় এবং পাশাপাশি তারা দেশের সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে। শিক্ষিত হলে, সমাজ-সচেতন হলে তারা দায়িত্ববান প্রবুদ্ধ নাগরিকে (স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর ভাষায় 'enlightened citizen') পরিণত হবে। তখন সেই নাগরিকের দায়িত্ব কেবল নির্বাচনে ভোট দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সে দেশের প্রগতির জন্য নানা কর্মযজ্ঞে যোগ দেবে, রুজিরোজগারের কাজও সে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা মনে রেখে করবে। স্বামীজীর বাণী তার হৃদয়ে ধ্বনিত হবে, "ভুলিও না – তুমি

জন্ম হইতেই 'মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত'।[66]

৪) নারীর মর্যাদা ও শিক্ষা

আধুনিক পৃথিবীতে নারীর মর্যাদার, অধিকারের দাবী ওঠে ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে। এতে ফরাসী বিপ্লবের অবদান অনস্বীকার্য। সম্ভবত মেরী উলস্টোনক্রাফটের (Mary Wolstonecraft) লেখা *Vindication of the Rights of Woman* থেকে প্রথম নারী-অধিকারের দাবী ওঠে। বহুযুগ ধরে পৃথিবীর দেশে দেশে নারী ও পুরুষের অধিকারে বিপুল অসাম্য ছিল, নারী ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। দীর্ঘ সংগ্রাম, আন্দোলন ও অনেক নারীর আত্মত্যাগের ফলে ব্রিটেন সরকার ১৯১৮ সালে প্রথম মহিলাদের ভোটাধিকার মেনে নেয়।

প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান অনেক উঁচুতে থাকলেও কালক্রমে নানা কারণে নারী তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে, এমনকি মানুষের মর্যাদাটুকুও হারায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ভারতে নারীর প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। সেসব চেষ্টা সমকালের বিচারে প্রশংসনীয় হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল খণ্ডিত, কুণ্ঠিত। ১৮৫৬ সালে বেথুন স্কুলে মেয়েদের ভর্তির জন্য যে আবেদনপত্র বিলি করা হয়েছিল (যেটি সাম্মানিক সম্পাদক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে প্রচারিত হয়েছিল), তাতে লেখা ছিল – "None but the daughters of respectable Hindus are taken in...."[67] অর্থাৎ –"সম্মানীয় হিন্দুদের কন্যা ছাড়া আর কাউকে ভর্তি করা হবে না।"

আধুনিক ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম নারীকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁরই শিক্ষা অনুসরণ করে স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতিকে উন্নত সংহত রূপ দিতে হলে নারীর উত্থান, নারীর মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া প্রথম কর্তব্য। সেজন্য বারবার তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে দুটি শব্দ – 'নারী' ও 'জনগণ'। মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌লকে (ভগিনী নিবেদিতা) সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে আনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষা। পুরুষের শিক্ষার মতোই হবে নারীর শিক্ষা, তবে কিছু পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকবে। ব্যক্তি হিসেবে নারী ও পুরুষ সমান হলেও স্বামীজী মনে করতেন ক্ষমতার নিরীখে নারী পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিময়ী, অনেক বেশী সম্ভাবনাময়ী – বিশেষ করে ভারতে। "নারীরা সহজাত গুণে সভ্যতার বাণীবাহিকা।" আমেরিকায় একটি বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেন, "Women in statesmanship, managing territories, governing countries, even making war, have proved themselves equal to men— if not superior.... In India I have no doubt of that. Whenever they have had the opportunity, they have proved that they have as much ability as men.... They keep to the moral standard which is innate in their nature. And thus as governors and ruler of their state they prove — at least in India — far superior to men."[৬৪] –"রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতায়, প্রশাসকের ভূমিকায়, দেশশাসনে, এমনকি যুদ্ধবিগ্রহে নারীরা নিজেদের অন্ততঃ পুরুষদের সমান প্রমাণ করেছে

– যদি তাদের চেয়ে উন্নততর নাও হয়। ভারতের প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। যখনই তারা সুযোগ পেয়েছে, তারা প্রমাণ করেছে পুরুষদের মতই তারা সক্ষম।... তাদের সহজাত প্রকৃতি হল – তারা নৈতিক মান ধরে রাখে। আর এই কারণেই অন্ততঃ ভারতবর্ষে রাজ্যের পরিচালক ও শাসক হিসাবে নারীরা নিজেদের পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী পারঙ্গম প্রমাণ করেছে।" স্বামীজী বলেছিলেন, পাঁচশজন পুরুষের থেকে পাঁচশজন নারীর দ্বারা দেশের কল্যাণ তাড়াতাড়ি সম্ভব। আক্ষেপ করে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, "এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছে। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কী করেছিস বল দেখি ? স্মৃতি ফৃতি লিখে, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ করে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine (উৎপাদনের যন্ত্র) করে তুলেছে। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই-সব মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ, সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিন্ কালে পারবেও না।"[৬৯] শিক্ষা দিয়ে নারীজাতিকে সর্ববন্ধনমুক্ত করতে হবে কারণ "The idea of perfect womanhood is perfect independence."[70] অর্থাৎ "পূর্ণ নারীত্বের অর্থ হল পূর্ণ স্বাধীনতা।" কিন্তু পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে তাদের পবিত্রতা যেন ক্ষুণ্ন না হয় – এই ছিল স্বামীজীর অভিমত। ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করে

স্বামীজীর সিদ্ধান্ত ছিল – "ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃভাব" – মায়ের পবিত্রতা, স্বার্থশূন্যতা ও স্নেহ – "...the ideal of woman in India is the mother...."[71]

নারীর আপন মহিমা প্রকাশের পথে শুধু নয়, সমাজের উন্নতিতেও বাল্যবিবাহ এক ভয়ানক বাধা, যাকে স্বামীজী পৈশাচিক বলেছেন। স্বামীজী তীব্রভাবে বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন। গুরুভাই স্বামী সারদানন্দকে লিখেছিলেন, "...বাল্যবিবাহ আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি।... আর এই মহাপাপে আমাদের জাতকে ডুবতে হচ্ছে। অতএব এরূপ পৈশাচিক প্রথাকে যদি আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করি, তবে নিজেই নিজের কাছে ঘৃণ্য হবো।"[72]

জাতীয় সংহতি রক্ষা করতে চাইলে জাতির অর্ধাংশ নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, তাকে পূর্ণ স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। স্বামীজীর স্পষ্ট অভিমত, "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।"[73]

৫) বর্ণভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ

ভারতীয় জাতির সংহতির সামনে এক বড় বিপদ হল বর্ণভেদপ্রথা, জাতির অজস্র বিভাগ-উপবিভাগ, সর্বোপরি অস্পৃশ্যতা। একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব প্রগতি সত্ত্বেও বর্ণে-বর্ণে ভেদ-ঘৃণা আজও ভারতের জাতীয় জীবনে যেন কর্কট রোগের মত ছড়িয়ে পড়ছে। বঞ্চিত মানুষ তাদের ন্যায্য

অধিকার লাভের দাবীতে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন করে চলেছে। আবার ক্ষমতা ও অর্থের খেলায় সব বর্ণেরই কিছু চতুর মানুষ জাতপাত নিয়ে রাজনীতি করছে। কিন্তু সমাজের বঞ্চিত মানুষ বঞ্চনা থেকে কোনোভাবেই মুক্ত হতে পারছে না। এক্ষেত্রেও স্বামীজীর কথা আমরা শুনিনি। সমগ্র ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে স্বামীজী বলেছিলেন, "Before flooding India with socialistic or political ideas, first, deluge the land with spiritual ideas."[74] – "ভারতকে সমাজতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক ভাবের দ্বারা প্লাবিত করার আগে প্রথমে তাকে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর।"

বর্ণভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আধুনিক কালে কোনো আন্দোলনের প্রসঙ্গ এলে সাধারণভাবে মহাত্মা গান্ধী, বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রভৃতি ব্যক্তিদের নাম আমাদের মনে আসে। কিন্তু, আমরা হয়তো অনেকেই জানি না, এসব আন্দোলনের অনেক আগেই, ১৮৯৭ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরেই স্বামী বিবেকানন্দ দক্ষিণ ভারতে – যেখানে জাতিভেদপ্রথা প্রবলরূপে বর্তমান ছিল, সেখানে রক্ষণশীল সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে জাতিভেদের এই কলঙ্কের কথা এবং তা নির্মূল করার কথা বলেছেন। সেখান থেকে লাহোর পর্যন্ত দেশের নানা শহরে একের পর এক জনসভায় স্বামীজী বারংবার সেই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। স্বামীজীর দৃঢ় অভিমত ছিল, জাতিভেদ একটি সামাজিক প্রথা, আসল ধর্মের সঙ্গে এর আদৌ কোন যোগ নেই। প্রথমবার আমেরিকা পৌঁছানোর কয়েক মাস পরে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "Caste is

simply a crystallised social institution... which is now filling the atmosphere of India with its stench..."[75] – অর্থাৎ "জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক প্রথা ছাড়া কিছুই নয়, যা এখন ভারতবর্ষের আবহাওয়াকে দুর্গন্ধে পূর্ণ করছে।" দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিলেন, "Modern caste distinction is a barrier to India's progress. It narrows, restricts, separates."[76] – "আধুনিক জাতিভেদ ভারতের প্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। এই প্রথা সমাজকে সঙ্কীর্ণ, সঙ্কুচিত, বিভক্ত করে।" স্বামীজী মনে করতেন, আধুনিক অর্থনীতি ও আধুনিক ভাবধারার প্রভাবে জাতিভেদ প্রথা অনতিবিলম্বে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি অন্তর থেকে ভেদভাব দূর করতে না পারি, তাহলে কোনো না কোনো রূপ নিয়ে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা বিরাজ করবে সমাজে।

বর্ণভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতাকে 'পাপ' বলে উল্লেখ করে লাহোরে 'বেদান্ত', বক্তৃতায় আন্তরিকভাবে আহ্বান করেছিলেন স্বামীজী –"wipe off this blot" –"এই কলঙ্ক মুছে ফেলো।" যুবকদের কাছে আবেদন করেছিলেন, "Young men of Lahore, understand this, therefore, this great sin, hereditary and national, is on our shoulders. There is no hope for us. You may make thousands of societies twenty thousand political assemblages, fifty-thousand institutions. These will be of no use until there is that sympathy, that love, that heart, that thinks for all; until Buddha's

heart comes once more into India; until the words of the Lord Krishna are brought to their practical use, there is no hope for us.... Therefore, young men of Lahore, raise once more that mighty banner of Advaita (non separateness).... Unfurl that banner of love!.... The nation is sinking, the curse of un-numbered millions is on our heads... what we want is character, that steadyness and character that make a man cling on to a thing like grim death."[77] –"অতএব হে লাহোরবাসী যুবকগণ, এটা বোঝ যে আমাদের কাঁধে বংশপরাম্পরাগত ও জাতীয় মহাপাপের এই বোঝা রয়েছে। (এ পাপ দূর করতে না পারলে) আমাদের কোন আশা নেই। তোমরা হাজার হাজার সমিতি গঠন করতে পার, বিশ হাজার রাজনীতিক সম্মেলন করতে পার, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করতে পার। কিন্তু এসবে কিছুই ফল হবে না, যতদিন না সেই সহানুভূতি, সেই ভালবাসা, সেই হৃদয় – যা সকলের জন্য অনুভব করে – তোমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়। যতদিন না ভারতে আবার বুদ্ধের হৃদয়বত্তা ফিরে আসে, যতদিন না ভগবান কৃষ্ণের বাণী ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ হয়, ততদিন আমাদের আশা নেই। অতএব, লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, আবার অদ্বৈতের (অভেদভাবের) সেই মহামহীয়ান পতাকা উড্ডীন কর।... প্রেমের সেই পতাকা উন্মোচিত কর!... এই জাতি ডুবছে; অগণিত মানুষের অভিশাপ

আমাদের মাথার ওপর।... আমাদের চাই চরিত্র, চাই এরূপ দৃঢ়তা ও চরিত্রবল, যাতে একটা ভাবকে মানুষ মরণকামড়ে ধরে থাকতে পারে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এই অভেদভাবের মূর্তবিগ্রহ, এই প্রেমের ঘনীভূত রূপ। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে একজন মেথরের শৌচালয় পরিষ্কার করতে দ্বিধা করেননি। পবিত্রতাস্বরূপিনী নারী থেকে বারবণিতা – কেউ তাঁর কাছে এসে মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হননি। ভাবটি এই – "কখনো যেন মনে না হয়, আমি অন্যের চেয়ে বড়। কোনো অহংকার যেন মনে বাসা না বাঁধে। আমি যে সকলের সঙ্গে এক।" শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে সকলেই সন্তান – কোনো ভেদ নেই – সাধু ব্রহ্মচারী থেকে তথাকথিত নিম্নজাতির সাপুড়ে, পরমানন্দপুর ও শিরোমণিপুর গ্রামের আমজাদ-মফেতিরা, রেলের কুলি, আবার খ্রীষ্টান ডাক্তার, বোম্বাইয়ের পরবর্তী কালের বিখ্যাত পার্শী অভিনেতা ও পরিচালক সোরাব মোদী বা দক্ষিণ ভারতের অগণিত তথাকথিত উচ্চ ও নিম্নবর্ণের ভক্ত। কে নয় ? কারণ, শ্রীমায়ের সরল ভাষায়, "কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।" স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কেও নিবেদিতা বলেছিলেন, "আমার আচার্যদেব বেলুড়ের সেই ছোট্ট কক্ষে বসে সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করতেন।" এই আদর্শ সামনে থাকলে ভেদভাব সহজেই দূর হয়ে যাবে, সন্দেহ নেই।

৬) সংস্কৃত ভাষা

বহু ভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষ। তাই কোনো একটি বিশেষ

ভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলে বা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে তা জাতীয় সংহতির সহায়ক না হয়ে বরং পরিপন্থী হওয়ারই সম্ভাবনা থাকবে। স্বামীজী তাঁর অসমাপ্ত বই *India's Message to the World*-এ লিখেছেন "Community of language, govenment and জাতীয় সংহতির সহায়ক না হয়ে বরং পরিপন্থী হওয়ারই সম্ভাবনা থাকবে। স্বামীজী তাঁর অসমাপ্ত বই *India's Message to the World*-এ লিখেছেন "Community of language, govenment and above all, religion has been the power of fusion."[78] –"(ভারতে) ভাষাসমুদয়, শাসন ব্যবস্থা ও সর্বোপরি ধর্ম একীকরণের শক্তিরূপে কাজ করেছে।" কিন্তু তিনি এও জানতেন যে, সকলের একটি সাধারণ ভাষা সংহতির জন্য কাম্য হলেও এর দ্বারা প্রচলিত ভাষাগুলির প্রাণশক্তি নষ্ট হবে। – "A common language would be a great desideratum, but the same criticism applies to it, the destruction of the vitality of the various existing ones."[79] সেজন্য স্বামীজীর প্রস্তাব ছিল, এমন একটি মহান পবিত্র ভাষা গ্রহণ করতে হবে, অন্যান্য সকল ভাষায় যার প্রকাশ, আর ভারতবর্ষে সংস্কৃতই হল সেই ভাষা –"The only solution to be reached was the finding of a great sacred language of which all the others would be considered as manifestations, and that was found in the Sanskrit."[80] একথা ঠিক যে দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলি সংস্কৃত থেকে আসেনি, কিন্তু দীর্ঘকালের সংমিশ্রণের ফলে অনেক সংস্কৃত শব্দ

যেমন এই ভাষাতে প্রবেশ করেছে, তেমন বেশ কিছু দ্রাবিড় ও মুণ্ডা শব্দও প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেই গৃহীত হয়েছে। উর্দু ভাষাতেও পারসিক-আরবী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট প্রভাব।

সুতরাং সমস্ত প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ভাষার স্বাভাবিক গতি ও গুরুত্ব অক্ষুণ্ন রেখেও ভাষাগত ঐক্যসূত্র হিসাবে মর্যাদাসূচক পবিত্র সংস্কৃত ভাষাকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন স্বামীজী। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, "Sanskrit looms large behind all Indian languages, Aryan and non-Aryan. It is inse-parable from Indian history and culture."[৪১] – আর্য ও অনার্য – সব ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রেই সংস্কৃত ভাষার বিরাট ভূমিকা বর্তমান। ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি থেকে এই ভাষা অবিচ্ছেদ্য।"

৭) সম্পদ ও ক্ষমতার সমবন্টন

স্বাধীনতার পর থেকে আমরা দেখেছি, দেশের সম্পদ, অর্থ, শিক্ষা, ক্ষমতা যদি দেশের সর্বত্র সমভাবে বন্টন না হয়, তবে বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্যে অর্থ ও ক্ষমতা নিয়ে দাবী জোরদার হয়; বিচ্ছিন্নতা, আঞ্চলিকতা শক্তিশালী হয়ে উঠে জাতির ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য সমবন্টনের পাশাপাশি অনুন্নত অঞ্চলে দ্রুতহারে উন্নয়নের ব্যবস্থা করা দরকার। একথার ইঙ্গিত পাই স্বামীজীর চিন্তায়

– ব্রাহ্মণের ছেলের যদি একটি শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তবে চণ্ডালের ছেলের দশটি শিক্ষক প্রয়োজন। অসম বন্টনের নীতির মধ্যে ধ্বংসের যে বিষময় ফল লুকিয়ে আছে, তা আমরা হয়ত এখনও বুঝে উঠতে পারছি না। এ বিষয়ে স্বামীজী কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন; '*বর্তমান ভারত*'-এ লিখেছেন, "শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[৪২]

৮) ধর্মসমন্বয়

আজকের ভারতবর্ষে মনে হয় সবচেয়ে বড় বিপদ হল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন, সাম্প্রদায়িক বৈরিতা। এর একটা কারণ হল, আমরা অন্য ধর্ম সম্পর্কে তো জানিই না, নিজের ধর্ম সম্পর্কেও বিশেষ কোনো ধারণা আমাদের নেই। তাছাড়া ধর্ম জিনিসটা বংশপরিচয়ের মত একটা পরিচয় নয়, ধর্ম হল বাস্তব জীবনে অনুশীলন করার জিনিস, যার মাধ্যমে মানুষ তার পাশব প্রবৃত্তিগুলিকে অতিক্রম করে মানবীয় গুণে বিভাসিত হয় এবং ক্রমে সে তার দৈবী সত্তা (ব্রহ্ম সত্তা) অনুভব করে। সমস্ত ধর্মের লক্ষ্যই

হল এই। সেজন্য স্বামীজী ধর্মের একটা অতি সাধারণ, কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, "Religion is the idea which is raising the brute unto man, and man unto God."[৮৩] – "ধর্ম হল এমন একটি ভাব যা পশুকে মনুষ্যত্বে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন ধর্মের সাধনা করে একই সত্য অনুভব করলেন। তখন তিনি ঘোষণা করলেন, "যত মত তত পথ।" তাঁর জীবনসাধনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন, বিভিন্ন মতের মানুষ তাদের রুচির ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে একই সত্যে পৌছায়। এইভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন সকল ধর্মের 'সমন্বয়', তাদের মধ্যে 'অবিরোধ'। সেই বিচারে ধর্ম (Religion) আসলে একটিই, যা সনাতন শাশ্বত, আর বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক যে ধর্ম (religion) – হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ, শিখ ইত্যাদি – এগুলি সব ধর্মমত। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই অনুভূতি সম্পর্কে বলেছিলেন, "Thus from actual experience, he came to know that the goal of every religion is the same, that each is trying to teach the same thing, the difference being largely in method and still more in language."[৮৪] – "এইভাবে প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে তিনি জানতে পারলেন যে, প্রত্যেক ধর্মেরই লক্ষ্য এক, প্রত্যেকে একই জিনিস শিক্ষা দিতে চেষ্টা করছে – পার্থক্য প্রধানত লক্ষ্যে পৌছানোর পদ্ধতিতে এবং তার চেয়েও বেশী পার্থক্য ভাষায়।" সেই কারণে স্বামী বিবেকানন্দ

গুরুর শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "The religions of the world are not contradictory or antagonistic. They are but various phases of one eternal religion. That one eternal religion is applied to different plans of existence, is applied to the opinions of various minds and various races. *There never was my religion or yours, my national religion or your national religion; there never existed many religions, there is only the one*. One infinite religion existed all through eternity and will ever exist, and this religion is expressing itself in various countries in various ways...."[৮৫] – জগতের ধর্মগুলি পরস্পর বিরোধী বা শত্রুভাবাপন্ন নয়। এগুলি এক সনাতন ধর্মেরই বিভিন্ন রূপ। ঐ এক সনাতন ধর্মই মানব-অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন মনের ও নিভিন্ন জাতির মতামত অনুসারে ক্রিয়াশীল হয়। আমার ধর্ম আর তোমার ধর্ম, আমার জাতীয় ধর্ম আর তোমার জাতীয় ধর্ম বলে কিছু কোনোকালে ছিল না; ধর্ম ঐ একটিই আছে। এক অনন্ত ধর্ম চিরকাল ধরে ছিল এবং চিরকাল থাকবে। আর এই ধর্মই নিজেকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করছে।" সুতরাং সিদ্ধান্ত হল – "Therefore we must respect all religions."[৮৬] –"সেজন্য আমাদের অবশ্যই সকল ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতে হবে।"

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে যে secularism বা

ধর্মনিরপেক্ষতার কথা আছে, পাশ্চাত্যে তার একটি অর্থ রাষ্ট্র ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং আরেকটি অর্থ হল মানুষের মনকে আধ্যাত্মিক বিষয় থেকে সরিয়ে জাগতিক বিষয়ে আনা। কিন্তু ভারতীয় চিন্তায় 'এক সনাতন ধর্ম'ই সকল মূল্যবোধের মূলে। তাই ধর্মকে বাদ দিয়ে মানবসমাজের কোনো কিছু চলতে পারে না। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ তাই আলাদা। এদেশে এর অর্থ হল – সকল ধর্মকেই রাষ্ট্র সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখবে। একে তাই 'ধর্মনিরপেক্ষতা' না বলে 'ধর্মমত-নিরপেক্ষতা' বলা উচিত।

প্রত্যেক ধর্মের প্রধানত দুটি দিক আছে। একটি তার socio-doctrinal – সামাজিক-মতবাদমূলক, আর অন্যটি mystical, experiential বা spiritual – অতীন্দ্রিয় অনুভূতিমূলক, আধ্যাত্মিক (অতিপ্রাকৃত নয়) – যেটা ধর্মের আসল জিনিস। শাস্ত্র-দর্শন- মতবাদ, পুরাণ-কাহিনী, ক্রিয়া-অনুষ্ঠান-আচার-প্রথা হল সামাজিক-মতবাদমূলক দিক, আর নিজ জীবনে সাধনার দ্বারা পাওয়া জ্ঞানস্বরূপ-প্রেমস্বরূপ-আনন্দস্বরূপ সত্তার উপলব্ধি হল আধ্যাত্মিকতা।

স্বামীজী বলেছেন, "Religion is not intellectual jargon at all, but realisation."[৪৭] – "ধর্ম মোটেই বুদ্ধির কচকচি নয় – ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি।" তবে স্বামীজী এও বলেছেন, "Reason helps inspiration"[৪৮] – "যুক্তিবিচার অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভের সহায়ক।" যুক্তিবাদের সঙ্গে যথার্থ ধর্মের কোনো বিরোধ নেই, বরং এদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে যুক্তিবিচারকে সত্যলাভের পথ বলে মানা

হয়েছে। শঙ্করাচার্য বলেছেন, "স্বাত্মানং শৃণু মূর্খ ত্বং শ্রুত্যা যুক্ত্যা চ পুরুষম্।"[৮৯] – "হে মূর্খ ! শ্রুতির সাহায্যে যুক্তির দ্বারা তোমার নিজের আসল সত্তা সেই পুরুষকে জানতে চেষ্টা কর।" ধর্ম নিয়ে যত সমস্যা – গোঁড়ামি, বিবাদ, কুসংস্কার ইত্যাদি – সে সবের অন্যতম কারণ যুক্তিবিচার-বিহীনতা।

শাস্ত্র মতবাদ ক্রিয়ানুষ্ঠান হল ধর্মের বহিরঙ্গ, ফলের খোসার মতো। অর্থাৎ এগুলি অপ্রয়োজনীয় বা বর্জনীয় নয়, এগুলো গৌণ উপায়, যার উদ্দেশ্য ঠিক ধর্মকে পেতে সাহায্য করা। উদ্দেশ্য ভুলে উপায়কেই সব মনে করলে খোসা নিয়েই মেতে থাকতে হয়। স্বামীজীর সাবধানবাণী ঃ "Religious quarrels are always over the husks. When purity, when spirituality goes, leaving the soul dry, quarrels begin, and not before."[৯০] –"ধর্মীয় বিবাদ সর্বদাই হয় খোসা নিয়ে। যখন পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে হৃদয় শুষ্ক হয়ে যায়, তখনই শুরু হয় বিবাদ, তার আগে নয়।" ধর্মের সারবস্তুকে আত্তীকরণ করার চেষ্টা না করলে স্বাভাবিকভাবে ধর্মপালনকারীর মধ্যে গোঁড়ামি প্রবেশ করে। আবার ধর্মানুশীলন যদি বুদ্ধি-বিচারকে বাদ দিয়ে কেবল আবেগের তাড়নায় হয়, তা হলেও এক ধর্মের অনুগামীর সঙ্গে অন্য ধর্মের অনুগামীর বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কারণ পরম সত্যের প্রকাশেরও তারতম্য আছে। বিবাদের ফলে ধর্মের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়, ব্যক্তিগত জীবনে সদ্‌গুণের প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, মনকে অধিকার করে ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ক্রিয়া-সর্বস্ব ধর্মীয় গোঁড়াদের সহজেই স্বার্থান্বেষী

মানুষেরা নিজ স্বার্থ রক্ষার কাজে লাগাতে পারে।

ধর্ম আচার-অনুষ্ঠানে নেই, আছে অসীমের অনুভবে, প্রেমের প্রকাশে, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধি নাশে। কিন্তু অনেক মানুষের কাছে ধর্মের পরিচয়টাই সব। স্বামীজী বলেছেন "At the core, all sects and all religions have the same aim; and they were only quarreling for their own selfish purpose – they were not anxious about the truth, but about 'my name' and "your name."[৯১] –"সব সম্প্রদায় ও সব ধর্মের মূলে প্রবেশ করলে দেখব, তাদের লক্ষ্য একই; ধর্মের অনুগামীরা তাদের নিজ নিজ স্বার্থপর উদ্দেশ্যে কলহ করত – সত্য সম্পর্কে তাদের ব্যগ্রতা ছিল না, ছিল 'আমার নাম' আর 'তোমার নাম' নিয়ে।" সেজন্য স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "My master used to say that these names, as Hindu, Christian, etc., stand as great bars to all brotherly feelings between man and man. We must try to break them down first. They have lost their good powers and now only stand as baneful influences under whose black magic even the best of us behave like demons. Well, we will have to work hard and must succeed."[৯২] – "আমার গুরুদেব বলতেন, হিন্দু, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নামগুলো মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাবের বিরাট প্রতিবন্ধক। আমাদের প্রথমে এগুলোকে ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করতেই হবে। এই নামগুলো তাদের সমস্ত শুভশক্তি হারিয়েছে এবং এখন কেবল

অশুভ প্রভাব বিস্তার করছে, যার কুহকে পড়ে এমনকি আমাদের মধ্যে যাঁরা সেরা, তাঁরাও অসুরের মতো ব্যবহার করেন। যাই হোক, আমাদের এজন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং সফল হতেই হবে।"

ধর্মগুলির আলাদা আলাদা নাম বা পরিচয়ের অপব্যবহার করে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়। এই চলে আসছে বহুকাল ধরে – রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। রাজনৈতিক প্রভাব থেকে ধর্মকে মুক্ত করা না গেলে ধর্ম জাতীয় সংহতি স্থাপনের ক্ষেত্রে বারবার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। অধ্যাপক বদ্‌রুদ্দিন উমর ভারতের সমকালীন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, "In order to properly understand the basic character of communalism it must be kept in mind that it is a specific form of political use of religion."[93] – "সাম্প্রদায়িকতার মূল চরিত্র যথাযথভাবে বুঝতে হলে এটা মনে রাখা দরকার যে, সাম্প্রদায়িকতা হল ধর্মের এক বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক ব্যবহার।" স্বামীজী একথা বহুদিন আগেই বলেছিলেন। কারণ বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় উত্থান-পতন সম্পর্কে তিনি কেবল বই পড়ে জানেননি, এদেশের ও বিদেশের জনসমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের ফলে তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। তাই তাঁর সিদ্ধান্তগুলি ছিল অভ্রান্ত। তিনি বলেছিলেন, "Now, in my little experience I have collected this knowledge – that in spite of all the devilry that religion is blamed with, religion is not at all in fault; no religion ever persecuted men, no religion ever

burnt witches, no religion ever did any of these things. What then incited people to do these things ? Politics, but never religion; and if such politics takes the name of religion whose fault is that?" [৯৪] "আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, যে-সব শয়তানির জন্য ধর্মকে নিন্দা করা হয়, ধর্ম সেগুলির জন্য আদৌ দোষী নয়। কোনো ধর্মই কোনোদিন মানুষের ওপর অত্যাচার করেনি, কোনো ধর্মই ডাইনি অপবাদে কাউকে কখনো পুড়িয়ে মারেনি, কোনো ধর্মই কখনো এগুলোর কেনোটাই করেনি। তা হলে কে মানুষকে এই কাজগুলো করতে উত্তেজিত করল ? রাজনীতি – কখনোই ধর্ম নয়। এইরকম রাজনীতি যদি ধর্মের নাম নেয়, তাহলে সেটা কার দোষ ?"

স্বামী বিবেকানন্দ মহম্মদ সরফরাজ হুসেনকে লেখা একটি অনবদ্য চিঠিতে ভারতের জাতীয় সংহতির পথনির্দেশ দিয়েছিলেন, যা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভারতের অধ্যাত্মচিন্তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ সে পূর্ণ ঐক্য ও সাম্যের আদর্শ, ব্যাবহারিক জীবনে তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যেই ভারতের জাতীয় সংহতির মূলসূত্র নিহিত।

স্বামীজী লিখেছিলেন, "We want to lead mankind to the place where there is neither the Vedas, nor the Bible, nor the Koran; yet this has to be done by harmonising the Vedas, the Bible, and the Koran. Mankind ought to be taught that religions are but the varied expressions of THE RELIGION, which is Oneness, so that each may choose the path that suits him best."[৯৫] –"আমরা মানবজাতিকে সেই

স্থানে নিয়ে যেতে চাই – যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরানও নেই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই এটা করতে হবে। মানুষকে শেখাতে হবে যে, সকল ধর্ম একত্বরূপ সেই "এক ধর্মেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র; সুতরাং যার জন্য যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সেইটিকেই সে বেছে নিতে পারে।"

সাম্যের মহান তত্ত্ব আবিষ্কারে বেদান্তের ভূমিকা এবং ব্যাবহারিক জীবনে সাম্যের প্রয়োগে ইসলাম ধর্মের অবদান সম্পর্কে ঐ একই চিঠিতে স্বামীজী বলেছিলেন – "Whether we call it Vedantism or any ism, the truth is that Advaitism is the last word of religion and thought and the only position from which one can look upon all religions and sects with love. I believe it is the religion of the future enlightened humanity. The Hindus may get the credit of arriving at it earlier than other races, they being an order race than either the Hebrew or the Arab; yet practical Advaitism, which looks upon and behaves to all mankind as one's own soul, was never developed among the Hindus universally.

"On the other hand, my experience is that if ever any religion approached to this equality in an appreciable manner, it is Islam and Islam alone.

" Therefore, I am firmly persuaded that without the help of practical Islam, theories of Vedantism, however fine and wonderful they may be, are entirely

valueless to the vast mass of mankind."[96]

—"একে আমরা বেদান্তই বলি আর যা-ই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্ম এবং চিন্তার শেষ কথা ; কেবল অদ্বৈতভূমি থেকেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চোখে দেখতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, এটি ভাবী শিক্ষিত মানবসমাজের ধর্ম। হিন্দুরা অন্যান্য জাতির আগে এই তত্ত্বে পৌঁছানোর কৃতিত্ব পেতে পারে, কারণ তারা হিব্রু কিংবা আরব জাতির থেকে প্রাচীনতর; কিন্তু কর্মে পরিণত অদ্বৈত – যা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলে দেখে এবং সেইভাবে ব্যবহার করে থাকে – তা হিন্দুদের মধ্যে কখনও সর্বজনীনভাবে বিকশিত হয়নি।

"অপর পক্ষে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, কখনও যদি কোনও ধর্ম ব্যাবহারিক জীবনে এই সাম্যের বেশ কিছুটা কাছাকাছি এসে থাকে, তবে তা ইসলাম, একমাত্র ইসলাম। (এমন আচরণের ভিত্তি যে তত্ত্ব, সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা বেদান্তে আছে এবং ইসলাম ধর্ম সেই তত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণত সচেতন নয়।)[97]

"এইজন্য আমাদের দৃঢ় ধারণা – বেদান্তের তত্ত্ব যতই সূক্ষ্ম ও চমৎকার হোক না কেন কর্মে পরিণত ইসলামের সহায়তা ছাড়া তা বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের কাছে সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন।"

স্বামীজী গভীরভাবে আশা করেছিলেন –

"For our own motherland a junction of the two great systems, Hinduism and Islam — Vedanta brain and Islam body — is the only hope.

"I see in my mind's eye the future perfect India rising

out of this chaos and strife, glorious and invincible, with Vedanta brain and Islam body."[৭৪]

–"আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই – বেদান্ত-মস্তিষ্ক (সাম্যের তত্ত্ব) ও ইসলাম-দেহ (সাম্যের আদর্শে গঠিত সমাজ) – একমাত্র আশা।

"আমি মানস চক্ষে দেখছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বেদান্ত-মস্তিষ্ক ও ইসলাম-দেহ নিয়ে মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠছে।"

সার কথা

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে আমরা যদি এখনও জাতীয় সংহতির জন্য চেষ্টা করি, সংহতি শুধু স্থাপন হবে তা নয়, তা দৃঢ়তর হবে, যা অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব বলে মনে হয় না। তাঁর পথে ভারতীয় জাতির সংহতি হলে তা বিশ্ব-সংহতির পথও সুগম করবে সন্দেহ নেই। কারণ এই চিন্তার মূল কথা "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য"। বাইরে নানা ভিন্নতা থাকবেই, কিন্তু অন্তরে শাশ্বত ঐক্য বিদ্যমান। স্বামীজী বলেছিলেন, "Unity in variety is the plan of creation, individuality in universality."[৭৭] – "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সর্বজনীনতার মধ্যে প্রত্যেকের বিশেষত্ব – সৃষ্টির এটাই পরিকল্পনা।" বিচিত্রতাকে স্বীকার না করলে সৃষ্টিকেই অস্বীকার করা হয়, জগতের বিভিন্নতাকে না মানলে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। আবার নানা ব্যক্তির মিলনে গঠিত সমাজেই একক ব্যক্তির অবস্থান সম্ভব, যে মিলনের ভিত্তি হল অন্তরের ঐক্য, যা বৈচিত্র্যকে গ্রহণ

করতে সঙ্কুচিত হয় না। হাজার হাজার বছর আগে তাই ভারতের মানুষ প্রার্থনা করেছিল,

"জনং বিভ্রতী বহুধা বিবাচসং নানাধর্মাণং পৃথিবী যথৌকসম্।
সহস্রং ধারা দ্রাবিণস্য মে দুহাং ধ্রুবেব ধেনুরনস্ফুরন্তী ॥[100]

—"ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসরণকারী ও নানা ভাষাভাষী জনসমুদয়কে একটি পরিবারের মতো যিনি আশ্রয় দিয়েছেন, সেই অবিনাশী ও স্থির পৃথিবী – গোমাতা যেমন অবিরত দুধ দেয়, তেমন করে আমাদের অসংখ্য ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন।"

স্বামীজীর ভাবধারা জাতীয় স্তরে প্রয়োগ করবে কে ? তাঁকে এতকাল অধ্যয়নই করা হয়নি। এখনও তাঁর চিন্তা সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিকর, মিথ্যা, বিকৃত রচনা প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। ভগিনী নিবেদিতা যথার্থই বলেছিলেন, এখনও তাঁর বাণীর বিশালতা ও তাৎপর্য বুঝে .ওঠার 'সৌভাগ্য' আমাদের হয়নি।

তাই ভারতের জাতীয় সংহতি প্রসঙ্গে আমরা আবার স্মরণ করিয়ে দিই স্বামীজীর বাণী –

"Call up the divinity within you, which will enable you to bear hunger an thirst, heat and cold.... No great work can be done without sacrifice.... Lay down your comforts, your pleasures, your names, fame or position, nay even your lives, and make a bridge of human chains over which millions will cross this ocean of life. Bring all

the forces of good together. Do not care under what banner you march. Do not care what be your colour – green, blue, or red – but mix all the colours and produce that intense glow of white, the colour of love. Ours is to work. The result will take care of themselves.... one vision I see clear as life before me : that the ancient Mother has awakened once more, sitting on Her throne rejuvenated, more glorious than ever. Proclaim Her to all the world with the voice of peace and benediction."[101]

– তোমাদের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তি জাগিয়ে তোল, যা তোমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম সহন করার শক্তি দেবে।... স্বার্থত্যাগ ছাড়া কোন মহৎ কাজ সাধিত হতে পারে না।... আরাম, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নাম যশ পদ, এমনকি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দাও, আর মানবজীবনের শৃঙ্খল দিয়ে এমন একটি সেতু নির্মাণ কর, যার ওপর দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক এই জীবনসমুদ্র পার হয়ে যাবে। সকল শুভশক্তিকে একত্র কর। তুমি কোন্ পতাকাতলে থেকে অগ্রসর হচ্ছ, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করো না। তোমার পতাকা নীল, সবুজ, না লাল – তা গ্রাহ্য করো না; সমস্ত রঙ মিশিয়ে প্রেমের শুভ্রবর্ণের তীব্র জ্যোতি প্রকাশ কর। আমাদের কাজ করে যেতে হবে, ফল আপনিই ফলবে।... আমি মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখছি, প্রাচীনা জননী নবযৌবনশালিনী হয়ে আবার জেগে উঠেছেন, তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিক মহিমান্বিতা হয়ে তাঁর সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। শান্তি ও আশীর্বাণীর সঙ্গে তাঁর নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।"

তথ্যসূত্র

[তথ্যসূত্রে *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Advaita Ashrama, Mayavati-এর ক্ষেত্রে *CW*, Publication Year, Volume No., page no. এবং স্বামী *বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-র ক্ষেত্রে *বাণী ও রচনা*, প্রকাশনার বছর, খণ্ড/পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হল। স্বামী বিবেকানন্দের মূল ইংরেজী রচনার স্বাধীন বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। স্বামীজীর *Complete Works* থেকে গৃহীত উদ্ধৃতিতে যেখানে যেখানে *italics* আছে, সেগুলি যোগ করা হয়েছে।]

1 *CW*.1979.III,p.188

2 *CW*,1977,I, p.xvii

3 *বিষ্ণুপুরাণ* ঃ ২:৩/১

4 *বিষ্ণুপুরাণ* ঃ ২:২/৫

5 শ্রীমদ্ভাগবতঃ ৫:৪/৯

6 শ্রীমদ্ভাগবতঃ ৫:৬/১৩

7 *CW*.1978.IV,p.296

8 রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃ ১২৫,প্রকাশক পঃবঃ সরকার নভেম্বর '৯০

9 Nanavutty, Piloo. *The Parsis.* National Book Trust of India, 1980.pp.38-40

10 *CW*.1997.IX, p.429

11 রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃ১২৩-১২৪, প্রকাশক পঃবঃ সরকার নভেম্বর '৯০

12 Tod, Colonel James, *Annals and Antiquity of Rajasthan.* Bombay : OUP, 1920. p. LV

13 কঠ উপনিষদ: ২/১/১

14 *CW*.1979.III, pp. 393-94

15 *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* : ৬.১১

16 তদেব: ২.৫

17 *CW*.1977. I, p.11

18 Smith, Vincent. *The Oxford History of India.* Oxford University Press, 1958, p.7

19 রায়, ডঃ অতুলচন্দ্র। *ভারতের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, কলকাতা: মৌলিক লাইব্রেরী, ১৯৮০, পৃঃ ২২
20 *CW*,1979, III, p.289
21 Renan, Ernest. "*What is Nation?*" Tran. Martin Thom. *Nation and Narration*. Ed. Homi K. Bhabha, Londan and NY : Routledge, 1990. pp. 18-19
22 *বাণী ও রচনা*, ১৩৮৩ বঃ, ৬ষ্ঠ/পৃ ২৪৯
23 দ্রষ্টব্য *CW*,1979, III, p.299
24 *CW*,1979, III, p.299
25 *বাণী ও রচনা*, ১৯৭৭, ৭ম/পৃ ৩৭১
26 *CW*,1979, V, p.52
27 *CW*.1977.I, p.428
28 *CW*,1978, VI, p.394
29 *বাণী ও রচনা*, ১৯৭৭, ৭ম/পৃ ১০৯
30 *CW*,1979, V, p.14
31 *Ibid*., p. 52
32 *Collected Works of Periyar EVR*, v. I. Madras: The Periyar Self-Respect Propaganda Institution p.100
33 *Ibid*., p. 18
34 Zelliot, Eleaner. *Ambedkar's World*. New Delhi: Navayana Pub Pvt. Ltd., p 147
35 *CW*.1979.III, p.381
36 Lenin, V.I. *The attitude of the Workers' Party to Religion*, Proletry, No. 45, May 13(26) 1909
37 Marx, Karl. "Introduction" *Marx's Critique of Hegel's Philosophy of Right (1843)*.Tr.Annette Jolin and Joseph O'Malley. Ed Joseph O'Malley. Cambridge University Press, 1970
38 মার্ক্স, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রেড্রিখ। *ধর্ম প্রসঙ্গে, মস্কো.প্রগতি প্রকাশন ১৯৭৯,পৃ ৯*
39 *CW*.1979. III, p.220
40. *Ibid., p. 149*

41 কূর্মপুরাণ ঃ পূর্ব বিভাগ ৪৫/২০

42 দ্রষ্টব্য : Husain, S. Abid. *The National Culture of India* : National Book Trust, 2010

43 *CW*.1979.III, p.294

44 দ্রষ্টব্য ঃ বিবেকানন্দ, স্বামী, *জাতীয় সংহতিঃ সমস্যা ও সমাধান*। কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ১৯৯০

45 Nivedita, Sister. *The Master As I Saw Him*. Calcutta: Udbodhan Office, 1977, p.194

46 *Ibid., p. 195*

47 *Prabuddha Bhararta*, July 1995 issue. p. 675

48 *CW*.1979.V , p.92

49 Kanaga, Maria Arokiam, *Man without Frontiers: The Ultimate Concern of Swami Vivekananda*, Kolkata: India Books 2014. p. 1

50 *CW*.1979. III, p.393

51 Eastern and Western Disciples, *The Life of Swami Vivekananda*, vol. I. Calcutta: Advaita Ashrama, 1979 p. 344

52 রোলাঁ, রোমাঁ, *বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী*, অনুঃ ঋষি দাস। কলিকাতাঃ ওরিয়েন্ট বুক কোঃ ১৩৯৯ বঃ, পৃ ৮১-৮২

53 *CW*. 1976. II, p.297

54 *CW*. 1979. V, p.192

55 *CW*. 1978. VI, p.49

56 Vivekananda, Sw *Ramakrishna and His Message*, Mayavati: Advita Ashrama, 1982. p. 10

57 Husain, S. Abid, *op. cit.* p. 207

58 *CW*. 1979. V, pp. 215-216

59 *CW*. 1979. III, p.287

60 *CW*. 1979. V, p.223

61 বাণী ও রচনা, ১৩৮৪ ব: ৯ম/পৃ ৪০৩
62 *CW*. 1979. V, pp. 28-29
63 *CW*. 1979. V, pp 29-30
64 *বাণী ও রচনা*, ১৩৮৩ ব: ৬ষ্ঠ/পৃ ২২৩-২২৪
65 *CW*.1977. VIII, pp 88-89
66 বাণী ও রচনা, ১৩৮৩ ব: ৬ষ্ঠ/পৃ ২৪৯
67 বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, *নারী শ্রেণী ও বর্ণ : নিম্নবর্গের নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান।* কলকাতা ২০০০, পৃ.৩০
68 *CW*.1977.IX, p.201
69 বাণী ও রচনা, ১৩৮৪ ব: ৯ম/পৃ ২০০
70 *CW*.1977. VIII, p.198
71 *Ibid., p. 57*
72 বাণী ও রচনা, ১৯৭৭ ৭ম/পৃ ২৩২
73 তদেব, পৃ ২৪৪
74 *CW*.1979. III, p.221
75 *CW*.1979. V, pp.22-23
76 *Ibid*. p.198
77 *CW*.1979. III, pp. 429-31
78 *CW*.1978. IV, p. 308
79 *Ibid.*, p. 309 80 *Loc. cit.*
81 Chatterjee, Suniti Kumar, *India:A Polyglot Nation and Its Linguistic Problems vis-a-vis National Integration.* Bombay: Mahatma Gandhi Memo Research Centre, 1973 p. 32
82 বাণী ও রচনা, ১৩৮৩ ব., ৬ষ্ঠ/পৃ ২৩৫
83 *CW*.1979. V, p.409
84 *CW*.1978. IV, p.174
85 *Ibid*. p.180

86 *Loc. cit.*

87 *Ibid.* p.230

88 *CW*.1979. VII, p.41

89 শ্রী শঙ্করাচার্য্য, অপরোক্ষানুভূতি: শ্লোক : ৩০

90 *CW*.1979. VI, p.127

91 *CW*. 1978. IV, p.174

92 *CW*. 1978. VI, p. 301

93 Umar Badruddin. "Communalism:A Specific Form of Political Use of Religion" *Communalism in Con- temporary India*.The Univ. of Burdwan, 1994,p. 61

94 *CW*. 1978. IV, p. 125

95 *CW*. 1978. VI, p. 416

96 *Ibid.* pp.415-416

97 দ্রষ্টব্য *বাণী ও রচনা*, ১৩৮৪ ব: ৮ম/পৃ ৩৯ (ইংরাজীতে লেখা এই চিঠির এই অংশটি *CW*. 1978. VI, pp. 415-416-এ নেই)

98 *CW*. 1978. VI, p. 416

99 *CW*. 1978. VI, p. 114

100 অথর্ববেদ : কাণ্ড-১২/সুক্ত-১/মন্ত্র-৪৫

101 *CW*.1978. IV, pp 352-53

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য হল ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারী মূল্যবোধকে – যা স্বামী বিবেকানন্দের 'মনুষ্যত্ব উন্মেষক' ও চরিত্র গঠনকারী আদর্শে গ্রথিত – বিশেষ করে কিশোর ও যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ও যুবশক্তিকে সুশৃঙ্খলভাবে নিঃস্বার্থ দেশসেবার মধ্য দিয়ে জাতিগঠনের কাজে সংহত করা, যার লক্ষ্য হল একটি সুন্দরতর সমাজের জন্য সুন্দরতর মানুষ গড়ে তোলা।

মহামণ্ডল একটি দ্বিভাষিক (ইংরাজী ও বাংলা) মাসিক মুখপত্র – "বিবেক জীবন" – এই আদর্শ ও সংস্থার সংবাদাদি প্রচারের জন্য প্রকাশ করে থাকে।

মহামণ্ডলের অন্যান্য প্রকাশন

স্বামী বিবেকানন্দ ও আমাদের সম্ভাবনা * জনগণের অধিকার –স্বামী বিবেকানন্দ * ভারতীয় সংস্কৃতি ও সনাতন ভাবধারা * ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য * চরিত্র গঠন * মনঃসংযোগ * নেতি থেকে ইতি * চরিত্রের গুণ * যুব সমস্যা ও স্বামী বিবেকানন্দ * এস দিশারী পথ দেখাও–স্বামী বুধানন্দ * পরিপ্রশ্নেন * একটি যুব আন্দোলন * বিবেক গীতি * জীবন গড়া * পুনরুজ্জীবনের উপায়। * National Integration and Swami Vivekananda * Religion : For Discord or Harmony ? * In Store for the Twenty-first Century * A New Youth Movement * Swami Vivekananda and the World of Youth ইত্যাদি।

মূল্য–পঁচিশ টাকা

ISBN 978-81-964732-3-5